আনন্দমেলা

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১
আনন্দবাজার-প্রকাশন

daCunha-GCM 31 BN

আনন্দমেলা

১৩ ফাল্গুন ১৩৮৭ • ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ • ৬ বর্ষ • ২৩ সংখ্যা

গল্প
ডাকু। শৈলেন ঘোষ ১০
বাসুর আপনজনেরা। অশেষ চট্টোপাধ্যায় ৫৫
আবহাওয়াবিদ্। হিমাদ্রি লাহিড়ী ৫৯
ছড়া
রাবণের ঘুম-শিক্ষা। মণীন্দ্র রায় ২৬
বিজ্ঞ ইঁদুর। রণজিৎ দাশ ২৭
ভুল-ভোলানো মন্ত্র। অনিরুদ্ধ কর ৬৬
সামলে পকেট। শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৬
উপন্যাস
সিসের আঙটি। বিমল কর ১৮
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৯
স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২১
বিশেষ রচনা
পাতাল-রেল। আশিস দেবরায় ৪
ভ্রমণকাহিনী
ভিনদেশী এক ছোট্ট গাঁয়ে। মহাশ্বেতা চৌধুরী ৩৬
খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি.কে. ৫৩
চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪
লেখাপড়া
ভাষার খেলা। কুম্ভক ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩
খেলাধুলো
দক্ষিণ আমেরিকাই শীর্ষে। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
হকিতে হল্যাণ্ড। অলোক দাশগুপ্ত ৪৫
বাংলা কেন হারল। বজ্রসেন ৪৬
অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ২৫, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯
বোলার প্যাসকোর পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১
প্রচ্ছদ-চিত্রজিৎ ঘোষ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশনস্ (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেটা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের

মন-মাতানো গল্প

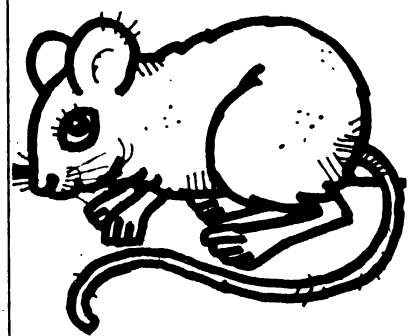

দাদুর ইঁদুর

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের

ভয়-জাগানো ভ্রমণকাহিনী

টাওয়ারের ভূত

আরও অজস্র আকর্ষণ

BAKER STREET

CHARING CROSS
JUBILEE LINE
30 APRIL 1979

লণ্ডনের ভূগর্ভ-রেলপথ।
(বাঁয়ে) জুবিলি লাইন
উদ্বোধনের সময় প্রিন্স চার্লস

পাতাল-রেল

আশিস দেবরায়

কলকাতা পাতাল-রেলের কাজ চলেছে

আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতায় পাতাল রেল চলতে শুরু করবে। আজ থেকে একশো বছর আগে কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলা শুরু হয়েছিল। এরপর ১৯০২ সালে এল ইলেকট্রিক ট্রাম। অল্পদিন বাদে ১৯০৯ সালে ট্যাক্সি আর ১৯১২ সালে বাস। কলকাতার বুক কাঁপিয়ে ডবল-ডেকার যাত্রা শুরু করেছিল ১৯২৬ সালে। বাণিজ্যিক লেনদেনে ও অসংখ্য কলকারখানার অফিস-কাছারিতে বড়-বড় শহরগুলো আজ বোঝাই।

কলকাতার জনসংখ্যা আজ এত বেড়ে গেছে যে, এখন কলকাতায় পাতাল-রেলের প্রয়োজনীয়তা সকলে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছেন। পৃথিবীর অন্যতম দুই বিখ্যাত শহর লণ্ডন ও প্যারিসে পাতাল-রেলপথ একশো বছরেরও আগে বসানো শুরু হয়েছে। এবং সেখানকার যানবাহনের সমস্যা এই পাতাল-রেলপথের প্রসারে, আজও তেমন শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠেনি।

১৯৭৪ সালের হিসাবে ২৫০ কোটি টাকায় দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৬.৪৩ কিলো মিটার দূরত্বে পাতাল-রেল তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে দমদমে ১.৫ কিঃ মিঃ দূরত্ব এবং টালিগঞ্জে সামান্য দূরত্ব

ট্রেন মাটির উপরে চলবে আর বাকি অংশে মাটির নীচে। ১৯৮৪ সালে ভিড়ের সময়ে এসপ্ল্যানেড-টালিগঞ্জ অংশে কুড়িটির মতো ও দমদম শ্যামবাজার অংশেও কিছু সংখ্যক গাড়ি চলার কথা। ১৯৮৬ সালে দমদম থেকে টালিগঞ্জে আঠাশটি গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা আছে। রাস্তায় ১৭টি স্টেশন থাকবে—সেগুলি হল দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরীশ পার্ক মহাত্মা গান্ধী রোড, মধ্য কলকাতা, চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর এবং টালিগঞ্জ। দমদম থেকে টালিগঞ্জ যেতে লাগবে ৩৩, দমদম থেকে এসপ্ল্যানেড ১৮ এবং এসপ্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ ১৫ মিনিট। প্রতি স্টেশনে ট্রেন থামবে ৩০ সেকেন্ড (আধ মিনিট)। প্রতি ট্রেনে ৮টা করে কামরা থাকবে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলবে ট্রেন। পাতাল-রেলের সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ৮০ কি মি, তবে গড়ে ঘণ্টায় ৩০ কি মি গতিতে চলবে।

লণ্ডন ও প্যারিস শহরে যেন এই পাতাল-রেলের জাল বোনা আছে। শহরের যে-কোনো অংশ থেকে অন্য অংশে পাতাল-রেলে যাওয়া যায়। তার জন্য কোথাও এক ট্রেন থেকে নেমে অন্য ট্রেনেও উঠতে হতে পারে। লণ্ডন শহরে পাতাল-রেল টেমস নদীর নীচে দিয়ে দক্ষিণ দিকেও প্রসারিত হয়েছে। প্যারিসেও ট্রেন মাটির ওপর উঠে সেইন নদীর ওপরকার পুল পেরিয়ে আবার পাতালে চলে গিয়েছে। লণ্ডনে পাতাল-রেল [illegible] কি মি দূরত্বের মধ্যে চলাচল করে, আর এই রাস্তার মধ্যে ২৪৯টা স্টেশন আছে। তবে এ কথা বলা দরকার যে, এই দুই শহরেই প্রথমে কলকাতার মতোই অল্প-অল্প করে পাতাল-রেল বসানো হয়েছিল। এবং একশো বছরের উপর ধরে ক্রমশ গোটা শহরে পাতাল-রেল ছড়িয়ে গিয়েছে।

কলকাতা শহরে ধীরে ধীরে পাতাল-রেলকে আরও নানা জায়গায় ছড়ানো যেতে পারে। যদিও ব্যাপারটা বিশাল খরচের আর তাতে সময়ও লাগবে প্রচুর। মাত্র গত বছরই লণ্ডন শহর থেকে হিথ্‌রো বিমানবন্দর

লণ্ডনের ভূগর্ভ-রেলপথ। চেয়ারিং ক্রস স্টেশন

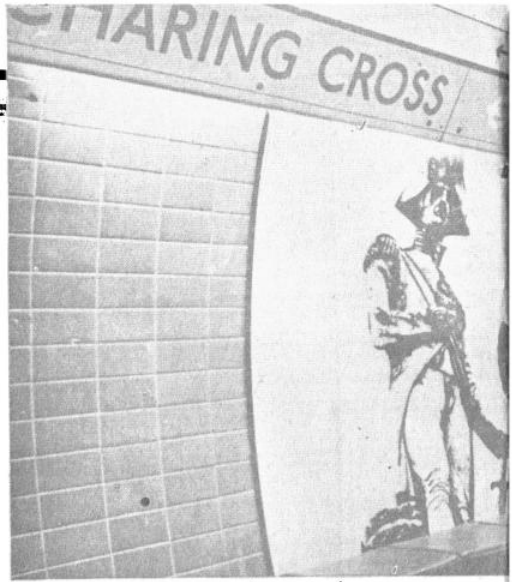

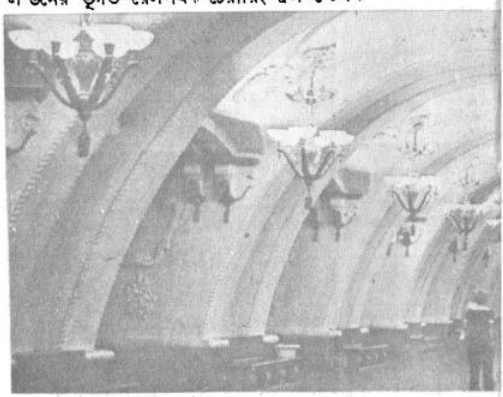

মস্কো-মেট্রো। একটি স্টেশন

পর্যন্ত নতুন পাতাল-রেল চালু করা হল। ইউরোপের এই দুই শহরে পাতাল-রেল কিন্তু সম্পূর্ণ 'কাট অ্যান্ড কভার' (মাটি খুঁড়ে লাইন বসিয়ে আবার ঢেকে দেওয়া) প্রণালীতে বসানো হয়নি, অনেক জায়গায় টিউব প্রণালীতেও (অর্থাৎ মাটির নীচে রাস্তা) তৈরি করা হয়েছে। কলকাতায়ও বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজারের ০.৮ কি মি অংশে সুড়ঙ্গ-প্রণালীতে মাটি খুঁড়ে পাতাল-রেল বসানোর কথা।

কলকাতায় পাতাল-রেল চালানোর জন্য প্রয়োজন ৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। যোগান দেবে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর-পোরেশন। লণ্ডন ও প্যারিস শহরে কিন্তু

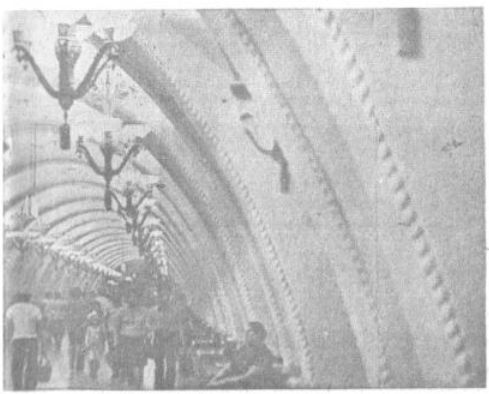

পাতাল-রেল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্র আছে। যেমন, লন্ডনের চেলসা ও গ্রীনিচে স্থাপিত হয়েছে পাতাল-রেলের নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র। সেখান থেকে ২৯৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাতাল-রেলের জন্য যোগান দেওয়া হয়। তবে লন্ডনের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডও কিছু কিছু বিদ্যুৎ পাতাল-রেলকে সরবরাহ করে—যার সাহায্যে মাটির ওপরের অংশে ট্রেন চলে।

কলকাতার স্টেশানগুলো হবে কোথাও একতলা আবার কোথাও দোতলা। তবে মাটির ওপর থেকে কোন স্টেশনই নয় মিটারের বেশি নিচু হবে না। বিদেশে অনেক শহরে একই স্টেশনে নানান স্তরে পাতাল-রেল বসানো আছে এবং অনেক স্টেশন মাটি থেকে বহু নীচে অবস্থিত। স্টেশনে যাওয়া - আসার জন্য অধিকাংশ জায়গায়ই এসকালেটর আছে। কিছু-কিছু স্টেশনে বড় লিফ্‌টও আছে। কলকাতায় আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে।

পাতাল-রেল যখন চলে, তখন প্রতিটি কামরার সব দরজা বন্ধ রাখতে হয়—না হলে, দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। প্রতিটি স্টেশনে যাত্রীরা নিজে থেকে দরজা খুলে নামতে পারবেন, কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে প্রতিটি কামরার দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। গার্ড বা ট্রেন-চালকের কামরার সব দরজা বন্ধ হওয়ার নির্দেশক আলো না জ্বললে ট্রেন আবার চলতে শুরু করবে না। লন্ডন ও প্যারিসে আজকাল কিছুসংখ্যক ট্রেনে এমন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে যে, আলো না জ্বললে ট্রেনই চলবে না। পাতাল-রেলের সব স্টেশনে ও সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথে বাইরে থেকে বাতাস ঠাণ্ডা করে চালিত করতে হবে, যাতে যাত্রীদের শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনো অসুবিধা না থাকে।

লন্ডন ও প্যারিসে বিনা টিকিটে ভ্রমণ বিরল। লন্ডনে বিভিন্ন স্টেশনের নির্দিষ্ট সব মেশিনে নির্দেশ অনুযায়ী পয়সা গলিয়ে দিলে টিকিট বেরিয়ে আসে। প্যারিসের অবস্থা আরও ভাল, সেখানে ১০টা টিকিট ১৫ ফ্রাঁতে কেনা যায়। পাতাল-রেলের যে-কোনো স্টেশন থেকে অন্য যে-কোনো স্টেশনে যেতে একটাই মাত্র টিকিট লাগে, অর্থাৎ, ভাড়া সব দূরত্বেই এক। তবে শুধু একটা টিকিট কিনলে ২½ ফ্রাঁ লাগে (১ ফ্রাঁ=২ টাকা)। স্টেশন থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এলেই টিকিটটা অকেজো হয়ে যায়। পাতাল-রেলে যাওয়ার পথে মেশিন বসানো আছে—সেটায় টিকিট ঢোকালে তাতে দাগ পড়ে এবং দরজা আপনা থেকে খুলে যায়। বেরোবার সময় লন্ডনে টিকিট কালেক্টর টিকিট নিয়ে নেয়। প্যারিসে তার প্রয়োজন নেই—কারণ সেখানে যে টিকিটে ঢোকার সময়ে একবার মেশিনের দাগ পড়ে, সেটা পুনরায় ঢোকালে আর গলবে না। ফলে সেই টিকিট আপনা থেকেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

মস্কো-মেট্রো। স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের স্থাপত্য-রীতি ও অঙ্গসজ্জা লক্ষণীয়

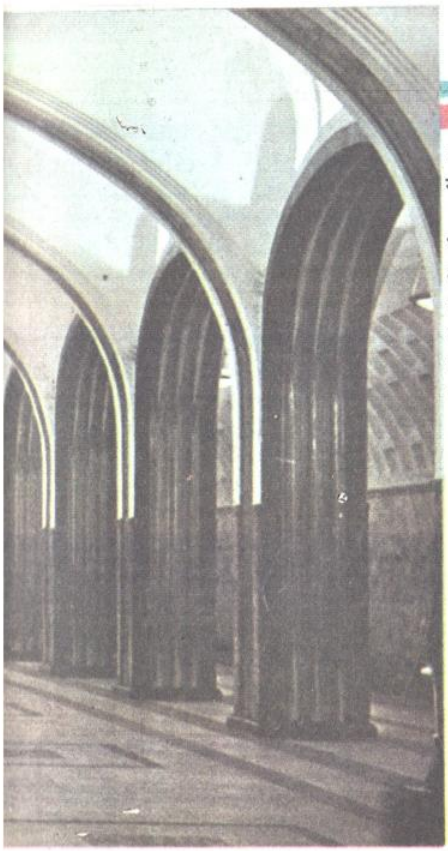

সাধারণত এখানে পাতাল-রেলের ভাড়া বাসভাড়ার চাইতে কিছু বেশি।

কলকাতায় পাতাল-রেল যাদের কারিগরি সহযোগিতায় স্থাপিত হতে চলেছে, সেই রুশীদের প্রধান শহর মস্কোর পাতাল-রেলপথের কাজ প্রথম চালু হয় ১৯৩২ সালে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত নতুন-নতুন লাইন বসানো সমানে চলে আসছে। বর্তমানে মস্কো মেট্রোর সর্বমোট

দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটার। স্টেশনের সংখ্যা ১১৫টি। প্রতিদিন ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। মাত্র ৫ কোপেকে (১ কোপেক=১২ পয়সা) যে - কোনো দূরত্বে যাওয়া যায়। এমন-কী ওই অর্থের বিনিময়ে সারাদিন পাতাল-রেলে ঘোরাঘুরি চলতে পারে। শ্বেতপাথর, গ্রানাইট, ইস্পাত এবং টাইলসের অলঙ্করণে স্টেশনগুলি অত্যন্ত নয়নশোভন। আরও আছে অপরূপ আলোকসজ্জা, ভাস্কর্য, মোজাইক এবং রঙিন কাঁচের সাজ। মস্কো মেট্রো রুশীদের প্রচণ্ড গর্বের বস্তু।

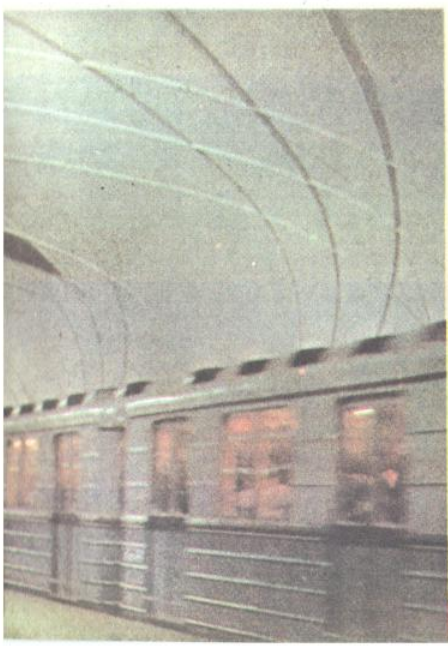

কলকাতার পাতাল-রেলও আমাদের গর্বের বিষয় হতে পারে, যদি আমরা এর নির্মাণ এবং সুরক্ষার দিকে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারি। এই ভিড়ের শহর কলকাতায় পাতাল-রেল যে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, বর্তমানে সুদীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যামের দিকে নজর করলেই তা অনায়াসে বোঝা যায়।

ডাকু

শৈলেন ঘোষ

আমি এক ডাকাত-দলের খুদে ডাকাত। আমরা দলে আছি সাতজন। দলের সর্দারকে আমার খুব ভাল লাগে। কেননা, সর্দার এক দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। এই বয়সে আমারও দারুণ সাহস। অবশ্য আমার সাহস আমার সর্দারেরই জন্যে। কারণ, সর্দার আমাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। শুনলে অবাক হবে, আমি এখন জানি, একটা মস্ত বাড়ির মস্ত পাঁচিল কেমন করে ডিঙোতে হয়। আমি জানি, শত্তুরের মুখোমুখি পড়লে কেমন করে তাকে ঘায়েল করতে হয়। বাড়ির অন্দরে ঢুকে, ঘাপটি মেরে কেমন করে গোয়েন্দাগিরি করতে হয়। গোয়েন্দাগিরি মানে তো সে এক সাংঘাতিক সাহসের কাজ। কারণ, সবার অজান্তে, সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খবরাখবর যোগাড় করতে হবে। তোমায় ঠিক-ঠিক বলতে হবে, কোন্ বাড়ির, কোন ঘরের কোথায় সোনার গয়না আছে, কিংবা টাকার বাণ্ডিল কোন বিছানার নীচে লুকনো আছে। এই খবরের ঠিকানাটা যদি একটু বেঠিক হয়ে যায়, তাহলে যে কী ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, সে তো বুঝতেই পারছ!

বেঠিক আমার কোনোদিনই হয়নি। কারণ, যখন আমি গোয়েন্দা তখন আমায় কে বলবে ডাকাত! তখন আমি ছেঁড়া ঝুলে-ঝুলি কাপড় পরে অন্ধ সাজব, নয়তো খোঁড়া। মিথ্যে মিথ্যে অন্ধের মতো ঠোক্কর খেতে-খেতে আমি হাঁটব, নয়তো খোঁড়াব।

আমি দেখেছি, অন্ধ দেখলেই যেন মানুষের দয়া-মায়া সবচেয়ে বেশি উথলে ওঠে। অবিশ্যি সব মানুষের কি আর! যারা ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে মানুষ ঠকায়, তারাই যেন বেশি দয়ালু। আর একদিন এমনি এক ফন্দিবাজ লোক আমাকে সত্যি-সত্যি অন্ধ ভেবে, আমার হাত ধরে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করে খাওয়াল। আর বিদায় দেবার সময় আমার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিল। আমি তো সারাক্ষণ অন্ধ সেজে বসে ছিলুম। আর সুযোগ পেলেই চোখ পিটপিট করে কোথায় কী আছে দেখে নিচ্ছিলুম। আলমারি খুলে যখন টাকাটি আমায় বার করে দিল, আমি স্পষ্ট দেখলুম, টাকা আর সোনাদানায় আলমারি একেবারে ঠাসা। আর কী। আমার কাজ সারা!

আমার এই সাহস আর বুদ্ধির জন্যেই সর্দারও আমায় তেমনি ভালবাসত। বলত, বড় হলে আমি একজন পাকা ডাকু হয়ে উঠব।

আমাদের লুটের মালগুলো সাতজনের মধ্যে ভাগাভাগি হলে সর্দারই পেত বেশি। আর আমার ভাগে কম। কারণ, আমি তো

ছোট। তাছাড়া ওদের ঘর-সংসার আছে। বাড়িতে ছেলে-বৌ আছে। টাকা-পয়সা নিয়ে মাঝে-মাঝে ওরা বাড়ি যায়। ওদের দেখে আসে। আর আমার টাকা-পয়সা ওই সর্দারের কাছেই থাকে। আমি নিয়ে কী করব? আমার তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি যখন আরও ছোট ছিলুম, তখন ঘর-বাড়ির কথা আমার মনেই হত না। জানতুম, এই আমার ঘর, সর্দারই আমার সব। কিন্তু এখন কাউকে বাড়ি যেতে দেখলে, আমার কেমন মন-কেমন করে। আমারও ইচ্ছে হয় বাড়ি যেতে। এক-একদিন রাতটা যখন নিঃঝুম হয়ে যায়, তখন যেন রাতের অন্ধকারটা মুখখানা ভীষণ ভেংচিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে, "তোর মা কই রে?"

আমি চমকে উঠি, আর মনে-মনে ভাবি, তাই তো, আমার মা কই?

আমাদের দলের সবচেয়ে পুরনো যে লোকটা, তাকেও আমার খুব ভাল লাগে। ফস্ করে একদিন তাকেই আমি জিজ্ঞেস করে বসি, "আচ্ছা, তোমরা তো সময় হলেই বাড়ি যাও। আমার বাড়ি কোথায়?"

আমি যে আচমকা লোকটাকে এতদিন পরে এমন একটা প্রশ্ন করে বসব, সে বুঝবে কেমন করে! তাই যেন থতমত খেয়ে গেল। আমার মুখের দিকে যখন চাইল, দেখলুম, তার চোখ দুটো সন্দেহে চমকে-চমকে ছটফট করছে। সে কোনো কথা বলল না বলে আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলুম, "বলো না, তোমাদের মতো আমিও বাড়ি যাই না কেন?"

এবার সে উত্তর দিল। বলল, "তোমার তো বাড়ি নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "সবার আছে, আমার নেই কেন?"

সে বললে, "তা আমি জানি না।"

"তবে কে জানে?"

"হয়তো সর্দার জানে।"

আমার আর তর সইল না। আমি তক্ষুনি সর্দারের কাছে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "সর্দার, আমার বাড়ি নেই কেন?"

আচমকা বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে যায়, সর্দার যেন তেমনি করে চমকে উঠল। তারপর নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে বললে, "এই তো তোর বাড়ি।"

"এইটা? তবে এখানে আমার মা-বাবা নেই কেন?"

সর্দার যেমন হঠাৎ হাসতে শুরু করে-

শোনো
ছোট্ট বন্ধুরা !
এবার এইচ এম ভি তোমাদের দিচ্ছে
ক্যাসেট ভর্তি
নার্সারী
রাইমস্
প্রীতি সাগরের
গাওয়া
৩৬টি
মজাদার ইংরাজী নার্সারী রাইমস্
সঙ্গে পাবে মাত্র ২ টাকায় একটি
চমৎকার বই যাতে আছে এই নার্সারী
রাইমস্-এর ছড়া ও রং করার জন্য
অনেকগুলি মজাদার ছবি।
ক্যাসেটের দাম: টা. ২৯·৮০ কর অতিরিক্ত
সেরা গান-বাজনা মানেই HMV
HTC-GCI-413 3:1

ছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ থমকে গেল। কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার আব্দার করলুম, "আমার মা-বাবা কোথায় সর্দার?"

সর্দার গম্ভীর গলায় বললে, "আমি জানি না।"

"কেন?"

আমার এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ যেন রেগে ঝলসে উঠল সর্দারের চোখ দুটো। গলার স্বরটা বেশ কর্কশ করেই সর্দার বললে, "কেনর উত্তর আমি দিতে পারব না।"

আমি কিন্তু ভয় পেলুম না। আমি বললুম, "তোমরা তো সময় হলেই বাড়ি যাও। কত কী কিনে নিয়ে যাও। আমাকে তোমরা ছুটি দাও না কেন? আমার কি ইচ্ছে করে না মা-বাবাকে দেখতে! বলো, আমার মা-বাবা কোথায় থাকে?"

"চোপ!" হঠাৎ বাজখাঁই গলায় ধমক দিল সর্দার।

আমিও গলা উঁচিয়ে উত্তর দিলুম, "কেন চুপ করব?"

বিদ্যুতের মতো লাফিয়ে উঠে সর্দারের হাতটা আমার গালের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করল। তারপর ধমক মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "আমার মুখের ওপর কথা!"

আমার ভীষণ লেগেছিল। আমি আহত গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে সর্দারের মুখের দিকে তাকালুম। বিশ্বাস করতে পারছি না, সর্দার আমায় মারল। আমি চোখের জল সামলাতে পারলুম না। কেঁদে ফেললুম। সর্দার ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তখন একা। নিঃসহায়!

কাঁদতে-কাদতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম রাত্তিরবেলা। আমি জানতে পারিনি, আজকের এখন এই রাতটা কত গভীর। হয়তো আমি এমনি নিশ্চিন্তেই ঘুমিয়ে থাকতুম। কিন্তু হঠাৎ যেন কার হাতের ছোঁয়া আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আমি চোখ চাইলুম। এ কী! এ যে সর্দার। যে-গালে আমায় আঘাত করেছিল, আমার সেই গালে সে হাত বুলোচ্ছে। আমি চেয়ে আছি অবাক চোখে। সর্দার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললে, "জ্বলে উঠতে পারলি না? আমি যখন মারলুম, বসিয়ে দিলি না কেন আমার বুকে একটা ছুরি?"

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। সর্দার উঠে দাঁড়াল। ওই দরজার এক কোণে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকার কী ভয়ংকর নিস্তব্ধ! হঠাৎ সর্দার কথা কইল। প্রচণ্ড চাপা আর ভাঙা গলার স্বর। বলল, "তোর বাড়ি আমি জানি না। কেননা, তোকে আমি রাস্তা থেকে চুরি করে এনেছি!"

সে-কথা শোনা মাত্রই যেন চমকে থেমে গেল আমার বুকের প্রাণটা। আমি উঠে বসে পড়লুম।

সর্দার বললে, "তুই তখন অনেক ছোট। রাস্তার ধারে বসে বসে খেলা করছিলি। তোর মা-বাবা হয়তো কছেই ছিল। আমি তোর মুখখানা কাপড়ে ঢেকে ছুট দিয়েছিলুম। তাই তখন তোর কান্নাটাও বোবা হয়ে গেছল। কেউ টেরও পায়নি। তখন থেকে কাছে-কাছে রেখে তোকে বড় করেছি। ডাকাত বানিয়েছি!" বলতে-বলতে সর্দার থামল। মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে গেল আমার। আমি অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সর্দারের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর বিছানায় মুখ গুঁজে আমার মা আর বাবার মুখ দুটি ভাবতে লাগলুম। কিন্তু কিছুই ভেবে পাই না আমি, কিচ্ছু না।

আমি শেষ রাত্রের অন্ধকারেই লুকিয়ে-লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম রাস্তায়। কেননা, এখানে আমার আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। টের পেল না কেউ। এমন-কী, সর্দারও না। আমি জানি না কোথায় যাব। শুধু জানি ডাকাতদলের এই আস্তানাটা আজ আমার কাছে অন্ধকূপের মতো ভয়ংকর। আমি যেন পালাতে পারলেই বাঁচি।

আমি বাঁচিনি। কারণ, রাত কেটে কখন সকাল হয়েছিল, আমার খেয়াল ছিল না। আমি আনমনে হাঁটছিলুম। এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমার ঘাড়টা খপাত করে খামচে ধরলে। আমি চমকে পিছন ফিরেছি। দেখি, সেই লোকটা। অন্ধ ভেবে যে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। লোকটা হয়তো এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠবে! কিন্তু কে দেবে চেঁচাতে! তার আগেই, তার পেটে মেরেছি এক ঘুঁষি! সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘাড় ছেড়ে পেটে হাত দিয়ে বসে

পড়েছে লোকটা। সেই তালে দে ছুট! কিন্তু লোকটা নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলে, "চোর, চোর!"

কেউ কিছু বোঝার আগেই, আমি এমন জোরে ছুট দিয়েছি যে, আর আমায় ধরতে হচ্ছে না। তবু তারা আমার পিছনে ছুটল। কিন্তু তখন তাদের নাগালের অনেক বাইরে আমি। আমি লুকিয়ে পড়েছিলুম। ওরা আমায় খুঁজে পেল না। লুকিয়ে পড়েছিলুম সামনে বেড়া দেওয়া মস্ত বাগানের মধ্যে। বাগানটার ভেতরেই একটু দূরে একটা ছোট্ট বাড়ি। আমার মনে হল, জায়গাটা নিরাপদ। এখানেই আমি চুপটি মেরে ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিলুম।

আশ্চর্য, চারিদিক খুব নিঃঝুম হলেও বাগানের ভেতর থেকে একটা খসখসানি আওয়াজ ভেসে আসছিল! আমি ঘাবড়ে গেলুম। তাই তো! কেউ দেখতে পেল নাকি! লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেকক্ষণ পরেও যখন কাউকে দেখতে পেলুম না, তখন চুপি-সারে ঝোপ সরিয়ে উঁকি মারলুম। এক-পা; এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখছি। হঠাৎ আমার চোখটা ধাঁধিয়ে গেল। দেখি কী, বাগানের মধ্যে একটা শিংওলা হরিণ। গাছের সঙ্গে বাঁধা। বাঁধন খোলার জন্য যতই সে পা ঠুকে ছটফট করছে, ততই গাছের শুকনো পাতায় খসখসানি আওয়াজ উঠছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভাবলুম, এখানে যখন হরিণ আছে, তখন নিশ্চয়ই কাছে-পিঠে হরিণের মালিকও আছে। কিন্তু হরিণটাকে দেখতে-দেখতে আমি মালিকের কথা ভুলেই বসেছি। সত্যি, কী সুন্দর দেখতে হরিণটাকে! হলুদ গায়ে ছোপ-ছোপ রঙ-বাহারি! চোখ দুটো টানা-টানা। শিং দুটো গাছের ডালের মতো আঁকা-বাঁকা। আমি অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার এত ভাল লেগে গেল! আমি এবার এগিয়ে গেলুম। একেবারে হরিণটার কাছাকাছি। কেউ দেখতে পেলে আমায় যে শেষ করে ছাড়বে, এ-কথাটা আমার আর মনেই এল না। হরিণটাও আমায় দেখে কেমন যেন থ হয়ে গেল। ছটফটানি থামিয়ে আমার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইল!

আমার সাহস বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে

॥ কলকাতার হিসেব নিকেশ ॥

কলকাতা মানেই ভীড় আর নোংরা।

কিন্তু একদিন কলকাতা বলতে বিশ্বের সেরা শহর বোঝাতো। আজকের কলকাতার এই বেহাল শুরু হয়েছে দেশ বিভাগের পর থেকে। ১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষ টুকরো হল দুই ভাগে। টুকরো হল সোনার বাংলা। লাখে লাখে উদ্বাস্তু একটু আশ্রয়ের জন্য কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। শহরের রাস্তাঘাট, স্টেশন, ফুটপাথ, আনাচ, কানাচ ভরে গেল অগণিত মানুষের সমাবেশে

কে বলবে তখন যে এ শহর মাত্র এত লক্ষ মানুষের বসবাসের জন্য তৈরী, কিংবা কলকাতার দৈনিক পানীয় জল সরবরাহের সর্বোচ্চ সীমা মাত্র এত গ্যালন, পয়ঃপ্রণালী তৈরী হয়েছিল অমুক সালে, পরিবহন যথেষ্ট নয়? মানুষ যেখানে আর্ত সেখানে হিসেব নিকেশের প্রশ্নই ওঠে না।

অথচ হিসেব তো একটা থেকেই যায়। সেখানে বে-হিসেব ঘটলেই অনর্থ ঘটবে অর্থের বটুয়ায়। কলকাতার দেশ-বিভাগ জনিত সমস্যাটা নিয়ে পঃ বঙ্গ ছাড়া আর কারো মাথা ব্যাথাই ছিল না।

সেই যে ১৯৪৭ সালে শহরটার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল, আর সেরে উঠতে পারল না। সি,এম,ডি, এ চেষ্টা করছে বহু দশকের কাজ একসঙ্গে করতে। কিছুটা কাজ হয়েছে। এখনও বাকি অনেক।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস কলকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত)

এগিয়ে গেলুম হরিণটার দিকে। তবে হরিণটার একেবারে কাছে যেতে গা-ছমছম করছে। ওই মাথার শিং যদি আমার পেটে বসিয়ে দেয়! তখন?

কিন্তু কই, হরিণটা তো শিং নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে না। আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে খালি পা ঠুকছে। যেন ডাকছে আমায়। আমি আরও একটু এগিয়ে গেলুম। হাত বাড়ালুম। আমার হাতটা চেটে দিল। হরিণটা কি তবে আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে? আমি হরিণটার কপালে হাত দিলুম। কিচ্ছু বলল না। গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। হরিণটা আনন্দে ঘাড় দোলাল। আমি হরিণটার বাঁধন খুলে দিলুম। হরিণটা প্রথমে থমকে গেল। তারপর বাগানের মধ্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটতে লাগল। আমি ধরতে গেলুম। পালিয়ে গেল হরিণটা। আমিও পিছু নিলুম। হরিণটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। আমিও চুপি-চুপি ঝোপের কাছে এসে লাফিয়ে পড়লুম। হরিণটা চোখের পলকে ভো-কাট্টা। যেন সে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিলে। আমার কী মজাই না লেগে গেল। আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম। হরিণটাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমি আনন্দে ফুলের গাছগুলো মাড়িয়ে-মুড়িয়ে শেষ করে ফেললুম। তবু হরিণটাকে ধরতে পারলুম না। তখন আমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাক দিলুম, "আঃ। আঃ।" আশ্চর্য, হরিণটা ভয় পেল না। আমার কাছেই এল। আমার পেটের মধ্যে মুখটা গুঁজে আমায় আদর করতে লাগল। আমার কাতুকুতু লেগে গেল। আমি খিলখিল করে হেসে ফেললুম। আমি হাসছি আর হাসছি। কখন যে হরিণের মালিক বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকেছিল, আমার নজর পড়েনি। কতক্ষণ যে সে আমার দিকে চেয়ে আমার হাসি শুনেছিল, তাও আমি জানি না। হঠাৎ দেখতে পেয়েছি। তাকে দেখেই চুপসে গেল আমার হাসি। দেখি, লোকটার মাথায় একটা তালপাতার টুপি। কাঁধে একটা তীর-ধনুক। খালি গা। কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু। মালকোঁচা মারা। আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। লোকটা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

বলব কী, সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা তীর-বেগে ছুট দিলে। ছুটতে-ছুটতে বাগানের বেড়া টপকে একেবারে বাগানের বাইরে। আমিও তাই দেখে মার ছুট। সটান হরিণটার পেছনে। লোকটা এবার ব্যস্ত হয়ে হেঁকে উঠল, "চোর, চোর।" আমার বুকটা ধক করে উঠল। লোকটা আমায় চোর বলল কেন? তবে কি আমায় চিনে ফেলেছে? না, ভাবছে হরিণটাকে আমি চুরি করে পালাচ্ছি? এবার আমার শেষ। তবু রক্ষে, কাছে-পিঠে কেউ ছিল না। আমায় ছুটতে দেখে কেউ আমায় ধরতে এল না। কিন্তু লোকটার হাত থেকে ছুটে এল ধনুকের ছিলা ছিটকে একটা ফলা-আঁটা তীর। একেবারে আমার পায়ের গোড়ালির মধ্যে বিঁধে গেল। আমি টাল সামলাতে পারলুম না। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে পেছন ফিরে দেখি, পায়ের ভেতর তীরটা আটকে আছে। টেনে খুলে ফেলতেই ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। আমি উঠে পড়লুম। দেখতে পেলুম হরিণটাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটাও ছুটে আসছে। আমি পালাতে গেলুম। পারলুম না। ভীষণ যন্ত্রণায় খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘুরপাক খাচ্ছি। লোকটা ছুটতে-ছুটতে কাছে এসে গেল। আমি বোধহয় ধরা পড়ে গেলুম। কিন্তু আশ্চর্য, আমায় ধরার আগেই, হরিণটা তীরের মতো লাফিয়ে এসে লোকটার পেটে মেরেছে এক ঢুঁ। সে একেবারে মাটির ওপর চিতপটাং। হকচকিয়ে গেছে। তড়বড়িয়ে উঠতে গেছে যেই, হরিণটা আবার দিয়েছে এক গোঁত্তা। আবার মেরেছে। লোকটা মাটির ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। এই রে। হরিণটা বুঝি ওকে মেরেই ফেলে। না, কোনো রকমে সামলে নিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েই মার ছুট। মাটিতে যে মাথার টুপিটা পড়ে রইল সেদিকে তার খেয়াল নেই। হরিণটাও ছাড়বে না। পেছনে তাড়া দিয়ে, এমন গুঁতিয়ে মারলে, যে লোকটা জেরবার।

এখানে আমার আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। এই ফুরসুতে পালাতে হবে। আমি মাটিতে পড়ে-থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় দিলুম। কেউ দেখলে চট করে আমায় চিনতে পারবে না। মাথায় তালপাতার টুপি পরে আমি ভারী কষ্ট করে দ্রুত হাঁটতে লাগলুম। আমি দেখছি, আমার পায়ের ক্ষত দিয়ে রক্তের ফোঁটাগুলি মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ছে। এই রক্তের ফোঁটাগুলি দেখে-দেখে কেউ যে আমার

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

হদিস পেয়ে যেতে পারে, এ-কথা মনে হতেই আমার বুকটা ভয়ে শুকিয়ে গেল।

কিন্তু এই ভয়ের চেয়ে এখন পায়ের যন্ত্রণাটাই আমায় অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে। এই কষ্ট নিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে আমি আর কোথাও যেতে পারলুম না। নিজেদের আস্তানাতেই ফিরে এলুম। বাঁচতে হলে এই আস্তানাতেই ফিরে আসতে হয়। অন্তত লুকিয়ে তো থাকতে পারব। কিন্তু আশ্চর্য, আস্তানাতে কেউ নেই। কাউকে তো দেখতে পেলুম না। না আছে সর্দার, না অন্য কেউ। এমন-কী, কোন জিনিস-পত্তরও তো দেখছি না। তবে কি আস্তানা ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। নাকি ধরা পড়েছে? তাহলে তো আমারও বিপদ। কিন্তু এখন আর আমি বিপদের কথা ভাবতে পারছি না। পায়ের প্রচন্ড ব্যথায় আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। মাটির ওপরই বসে পড়লুম। তারপর পায়ে হাত দিয়ে ছটফট করতে-করতে মুখ গুঁজে এলিয়ে পড়লুম।

আমি যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলুম আর মনে-মনে ভাবছিলুম, এখন আমি কী করব। এত কষ্টেও হরিণের কথাটা আমার বার-বার মনে পড়ছিল। নিজেকে নিজেই আমি ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। ছিঃ ছিঃ। আমি ডাকাত। আর ওই একটা ছোট্ট প্রাণী, কত সুন্দর।

আঃ। চমকে উঠলুম। আমার পায়ের ক্ষতটা কে যেন চেটে দিচ্ছে। পা সরাতে গিয়ে দেখি, এ কী। এ যে সেই হরিণটা। কোথা থেকে এল। তবে কি ও পথের ওপর আমার পায়ের রক্তের চিহ্ন দেখে-দেখে এসেছে এখানে। আমি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। আমার চোখের দু ফোঁটা জল মাটিতে পড়ার আগেই ও যেন মাথা পেতে দিল। কী জানি কেন, তখন যেন আমার মনে হল, আমি আবার দাঁড়াতে পারব। আমি দাঁড়ালুম। আমার মনে হল, তীর-বেঁধা আমার পায়ের ক্ষতের যন্ত্রণা হরিণের মুখের ছোঁয়া পেয়ে যেন জুড়িয়ে আসছে। আমি পা ছুঁড়ে লাফ দিলুম। আমার লাগল না। আমি চরকি খেতে-খেতে ছুটতে লাগলুম। কষ্ট হল না। তবে কি বনের কোনো ওষুধ মুখে এনে হরিণটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিল। আমি হরিণের গলাটা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলুম। হরিণটা বসে পড়ল। যেন বলছে, আমার পিঠে বোসো। আমি হরিণের পিঠে লাফিয়ে বসলুম। আমার মাথায় সেই তালপাতার টুপি। আমাকে পিঠে নিয়ে তীরবেগে ছুটল হরিণটা। আমি প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে হেসে উঠলুম।

ছুটতে-ছুটতে এ কোথায় নিয়ে এল হরিণটা আমায়। এদিকে তো আমি কোনো-দিন আসিনি। হরিণের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুট দিলুম। সবুজ ঘাস। কখনও দেখি, ঝাউগাছের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক পাখির নাচ। কখনও দেখি, অনেক ফুলে অনেক ফড়িং দোল দিচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ঝরনা যেন জলতরঙ্গের বাজনা বাজাচ্ছে। ঝরনার জলে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে গায়ে মাখলুম। মুখে ছিটোলুম। আঃ, কী ভাল লাগছে। তারপর শুয়ে পড়লুম পাথরের গায়ে। শুয়ে-শুয়ে আকাশের ছায়া দেখতে লাগলুম। আকাশের গায়ে-গায়ে মেঘ ভেসে যায়। কখনও সে-মেঘ আকাশের গায়ে হাঁসের ছবি এঁকে দিচ্ছে। উড়তে-উড়তে সে-হাঁস কখনও বাঘ, কখনও হাতি, নয়তো একটা মস্ত দানব। তারপর চেয়ে দেখি, মস্ত দানবের পেছনে-পেছনে জুড়ি-ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে ধেয়ে আসছে এক বীর পুরুষ। হাতে তার বর্শা। তার পেছনে এক বীর নারী। ওরা বুঝি মারবে দানবটাকে ওই বর্শার ঘা। হয়তো তাই। কেননা, ওই দানব যে ওদের ছেলেকে চুরি করে পালিয়েছিল। আজ ধরা পড়েছে।

চমক ভাঙল আমার। ভাবলুম, আমিই কি ওদের সেই ছেলে? ওই বীর নারী আর ওই বীর পুরুষ, ওরাই কি আমার মা আর আমার বাবা? হাওয়া উঠল। এলোমেলো হয়ে গেল মেঘের ছায়া। হারিয়ে গেল আমার মায়ের ছবি। আমার চোখ উপচে জল নামল। আমি কেঁদে ফেললুম।

হঠাৎ হরিণটা কাছে এল। আমার পাশে পাথরের ওপর বসল সে। আমার গায়ে মাথা ঠেকাল। কান্না-চোখে তার দিকে তাকালুম একবার। তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলুম। আদর করতে-করতে ক্লান্ত চোখ দুটি আমার বুজে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

ছবি সুনীল দাস

আগেকার কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে তা না-রাখাই ভাল। কিন্তু সেটা কী? পুরনো হাতবাক্সে পাওয়া এই আঙটিটা? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর গল্প শোনান। প্রয়াগ নামে একটা লোক কিছুদিন শিশিরদের বাড়িতে কাজ করেছিল। তারপর....

॥ ৭ ॥

প্রয়াগের কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

তুলসী এসে বলল, "পরাগ অন্য কোথাও চলে গেছে।"

শিশির কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "চলে গেছে মানে। তুমি ওর জানাশোনা এমন কাউকে পেলে না যে বলতে পারে কোথায় গেছে প্রয়াগ?"

তুলসী বলল, "পরাগের এক মামাকে পেলাম। গাঁয়ের মামা। সে বলল, ও নাকি কাশীপুরে চলে গিয়েছে। পাত্তা জানা নেই। আর-একজন বলল, বউবাজারে গিয়ে রিকশা টানছে। কার কথা ধরবে তুমি? আবার কেউ কেউ বলল, দেশে ফিরে গিয়েছে।"

বাবু কাছেই বসে ছিল। শুনছিল সব। শিশিরের মুখে প্রয়াগের ব্যাপারটা তার শোনা হয়ে গিয়েছে। বাবু বলল, "ওদের এই রকমই কান্ড। কলকাতায় আসে গতর খাটিয়ে রোজ-গার করতে। এক জায়গায় বড় থাকে না। তবে শুনেছি, দূরে গিয়ে পেটের ধান্ধা যদি না করতে হয় নিজেদের মহল্লা কেউ ছাড়ে না। প্রয়াগ নিশ্চয় কাছাকাছি নেই।"

শিশির রীতিমত হতাশ হয়ে উঠছিল বলল, "তুলসীদা, তুমি আরও খোঁজ নাও ওকে ধরা চাই।"

তুলসী অবাক হয়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ? আমি খোঁজটা নেব কোথায়? কাশীপুরে, না বউবাজারে?"

কথাটা মিথ্যে বলেনি তুলসী। কোথায় কাশীপুর, আর কোথায় বউবাজার? এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত। কাশীপুর কি ছোট জায়গা? সেখানে হাজার হাজার বেহারী। কত বস্তি। কত রকম কাজকর্ম। প্রয়াগ কোথায় আছে, কিসের কাজ করছে না জানলে খোঁজ নেওয়া অসম্ভব। সেই রকম বউবাজারে কয়েক শ' রিকশা ছুটছে দিবারাত্র। প্রয়াগকে কে খুঁজে বার করবে?

শিশির আর কোনো কথা বলল না। চুপ করে থাকল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তুলসী বলল, "আমি পানঅলাকে বলেছি। সে খোঁজ করবে। আমিও আর-একবার হাতিবাগান মহল্লায় যাব। যদি কেউ কিছু বলতে পারে। তবে পরাগকে ধরা মুশকিল।"

তুলসী আর দাঁড়াল না; চলে গেল।

আরও একটু বসে থেকে বাবু বলল, "নে ওঠ, সন্ধে হতে চলল।"

আজ কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি যাবার কথা। গতকাল শিশির কোথাও বেরোয়নি। সারা-দিন বাড়িতেই ছিল। মাঠের দিকেও যাওয়া হয়নি। কাল দিন খারাপ ছিল। পরশুর সেই বৃষ্টি কাল সকাল থেকে ছিনে-জোঁকের মতন লেগে থাকল। রোদ উঠল না; হুড়মুড় করে আকাশও ভেঙে পড়ল না, কিন্তু সারাটা দিন টিপটিপ লেগেই থাকল। এমন বেয়াড়া আবহাওয়া যে, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কাল বাবার সঙ্গে শিশির কথা বলেছে। বাবা প্রয়াগের ব্যাপারে কিছুই বলতে পারল না। লোকটা এসে হাতে-পায়ে ধরেছিল, বাবা রেখে দিয়েছিল বাড়িতে। লোকটা একটু ষন্ডা ধরনের হলেও ও তো বেচাল কিছু করেনি। বরং বাবাকে খুবই খাতির দেখাত।

শিশির বলল, "তুলসীদা বলছিল, লোকটা ভাল ছিল না।"

অমৃতবাবু হেসে বললেন, "তুলসীর একটা দোষ আছে। বাইরের লোক বাড়িতে আনলেই ওর মুখ গোমড়া হয়ে যায়। ও তো

বাড়ির ম্যানেজার। ওকে ডিঙিয়ে কেউ কিছু করলেই তুলসীবাবুর রাগ হয়।"

হাসাহাসি করেই বাবা কথাটা উড়িয়ে দিল।

শিশির অবশ্য বাবার মতন প্রয়াগকে নিরীহ ভাবতে পারল না। লোকটাকে একবার অন্তত ধরা চাই।

বাবু আবার বলল, "কী রে, উঠবি না?"

"হ্যাঁ, উঠছি।" বলে উঠে দাঁড়াল শিশির। "আজও মাঠে যাওয়া হল না?"

"তাতে আর কী হয়েছে? কাল যাব।"

"তুমি তো ফিরে যাবে পরশু?"

"তা তো যেতেই হবে। তবে তুই ভাবিস না। আমি খবর পেলেই আসব। তোর যদি কোনো দরকার হয় চিঠি লিখে দিবি। তোকে একটা ফোন নম্বরও দিয়ে যাব।"

শিশির জামা গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ বলল, "জানো বাবুদা, কাল আমার কিছু হয়নি। একেবারে ও-কে ছিলাম। সামান্য একটু মাথা ধরেছিল। তাও রাত্রে ঠিক হয়ে গেল।"

"বাঃ। ভাল খবর।"

"যদি এইভাবে ঝঞ্ঝাটটা কেটে যায়, বেঁচে যাই।"

বাবু উঠে পড়ল। "সেরে উঠছিস যখন তখন আর ভাবনা কী। আমি বলছি তুই একেবারে সেরে যাবি।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শিশির বলল, "হেঁটেই যাব।"

"তা ছাড়া কী। কাছেই তো।"

দুজনে বাড়ির বাইরে এল। আজ আব-হাওয়া ভাল। বৃষ্টি নেই। সকালে খানিক রোদ খানিক মেঘলা-মেঘলা ভাবে দিন কেটেছে।

হাঁটতে হাঁটতে শিশির বলল, "বাবুদা, আমি ঠিক করেছি, একবার হাজারিবাগ যাব।"

"হাজারিবাগ?"

"হ্যাঁ। এই ব্যাপারটার একটা ফরসালা করতে হবে।...আমি বুজরুকি মানতে রাজি নই। আঙুটি আঙটি, তার অদ্ভুত ক্ষমতা আসে কোথা থেকে!"

বাবু বলল, "হাজারিবাগে গিয়ে কী করবি? বুজরুকির তদন্ত?" বলে বাবু হাসল।

শিশির মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে তদন্তই

করবে। ওই আঙটি, মাঠের সেই লোক, প্রয়াগ—এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই নাকি? শিশিরের বিশ্বাস কিছু-একটা ভেতরের রহস্য আছে।

কথা বলতে বলতে দুজনে কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি পৌঁছে গেল।

শিশির বলল, "বাবুদা, আজ আমার বেশ ফ্রেশ লাগছে। বোধ হয় আজই প্রথম।"

বাবু হেসে বলল, "ভূত পালিয়েছে আর-কি! ভালই হয়েছে।"

কৃষ্ণদয়াল বোধহয় দুজনের জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন। খবর পেয়ে নীচে নেমে এলেন।

বৈঠকখানা-ঘরে শিশিররা বসে ছিল। কৃষ্ণদয়াল ঘরে ঢুকে বললেন, "কী শিশির, আছ কেমন?"

শিশির হাসির মুখ করল। "আজ বেশ ভাল আছি।"

কৃষ্ণদয়াল বসলেন। "আঙটিটা খুলে রাখার পর আর কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে না তা হলে?"

শিশির বলল, "পরশুদিন খানিকটা হয়েছিল। গতকাল কিছু হয়নি। একটু মাথা ধরেছিল, তাও পরে ছেড়ে গেল। আজ খুব ভাল লাগছে।"

বাবু ঠাট্টা করে বলল, "আজ শিশির লাফাতে লাফাতে এসেছে, কেষ্টদা। ওর ওল্ড ফর্ম ফিরে পেয়েছে।"

কৃষ্ণদয়াল হাসলেন। সিগারেট ধরালেন। "আঙটিটা আর পরছ না তো?"

"না।"

"রেখেছ কোথায়? পকেটে না আলমারিতে?"

"আলমারিতে তুলে রেখেছি।"

"বেশ করেছ। এখন পোরো না। দু-পাঁচ দিন থাক। এই সময়টা লক্ষ করে দেখো—কিছু হয় কিনা! যদি ভাল থাকো তবে ভালই। তারপর আবার একবার পরে এক্সপেরিমেণ্ট করবে।"

বাবু বলল, "পরার দরকার কী?"

"দরকার নেই কেন? আঙটিটার সত্যিই কোনো অলৌকিক গুণ আছে কিনা—আরও ভাল করে পরীক্ষা হয়ে যাবে। ঠিক কিনা শিশির?"

শিশির মাথা নাড়ল। কথাটা ঠিকই।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমি দু-একজনের সঙ্গে কথা বলেছি। বিশেষ ফল হয়নি। তবে একজন বলছে, কারও কারও শরীরে কোনো ধাতুর—মানে মেটাল-এর একটা রিঅ্যাকশান থাকে? ব্যাপারটা কীরকম জানো? এই ধরো সবাই যেমন নাইলনের মোজা পরতে পারে না, পায়ে চুলকুনির মতন হয়ে যায়, কিংবা ধরো মেটাল ফ্রেমের চশমা পরলে কানের পাশে ঘা হয়ে যায়—অনেকটা সেই রকম। এক-একজন মানুষের শরীর, তার ধাত এক-একরকম। কারও তেল সহ্য হয়, গন্ধ সহ্য হয়, যে-কোনো খাবার সহ্য হয়। কারও কারও হয় না। সেই-রকম কোনো কোনো ধাতু কারও শরীরে একেবারেই সহ্য হয় না। সিসে, তামা, এমন-কি রুপোও নয়।" কৃষ্ণদয়াল সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিলেন। বললেন, "যদিও লাখে দশ লাখে একজনকে হয়ত পাওয়া যায় যার শরীরে বিশেষ কোনো ধাতুর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হয়—তবু ঠিক অতটা হবার কথা নয় শিশির, যা তোমার হয়েছে।"

বাবু বলল, "আপনি কি বলতে চান শিশিরের মেটাল রিঅ্যাকশান থেকে অসুখটা হয়েছিল?"

"না না, তা আমি বলছি না।" কৃষ্ণদয়াল বললেন, "মেটাল রিঅ্যাকশান শরীরে হতে পারে। তাও হয়ত ঘা হবে, কিংবা চামড়া লাল হবে, ঘামাচির মতন বিজগুড়ি বেরুবে। শিশিরের বেলায় তা তো হয়নি বাবু। ওর যা হয়েছে সেটা মোটেই বাইরের ব্যাপার নয়।"

বাবু একবার শিশিরের দিকে তাকাল। বলল, "ওর তো জ্বরজ্বালা সেরে যাবার পর যেটা হচ্ছে সেটা—"

এমন সময় চা-জলখাবার এল।

কৃষ্ণদয়াল বললেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, মেটাল থেকে কোনো মেণ্টাল রিঅ্যাকশান হতে পারে। আমি বরং বলব, আঙটিটার সঙ্গে কোনো ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ওটা ভৌতিক হতে পারে; বা বলা যায়—ওই আঙটির কোনো অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।"

শিশির বলল, "আপনি ভূতুড়ে গল্প বিশ্বাস করেন?"

"করতে চাই না। তবু করতে হয় কখনও কখনও।"

শিশির চুপ করে গেল।

ছবি সুনীল পাল

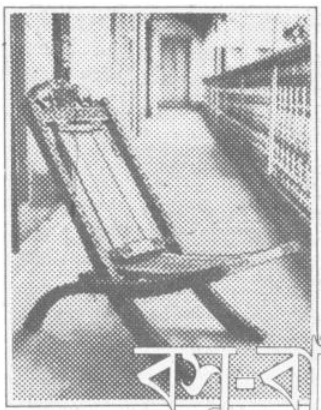

শিশিরকুমার বসু

॥—২০॥

জেলে থাকতেই বাবা তখনকার কেন্দ্রীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর তাঁর মুক্তির দাবি করে, অন্ততপক্ষে তাঁর সেণ্ট্রাল অ্যাসেমব্লিতে যোগদানের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য, বিরোধী পক্ষ অনেক শোরগোল করলেন। কিন্তু সরকারের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। বাবার অ্যাসেমব্লির আসনটি খালিই পড়ে রইল।

এক দুপুরে যখন বাবার মুক্তির আদেশ এল তখন আমি ইস্কুলে। মনে আছে, খবরটা পেয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের অনুমতি নিয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি সারা পথটা দৌড়ে এসেছিলাম। বাবা জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন দেশের পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। বাংলা দেশে কংগ্রেসের তখন একজন বিশিষ্ট নেতার প্রয়োজন। দুই প্রধান নেতার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে থাকতেই মারা গেছেন। রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে, কবে ফিরবেন খুবই অনিশ্চিত। বাংলার কংগ্রেসের বেশির ভাগ দল ও উপদল বাবাকেই চাইলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সবেমাত্র ভারতের জন্য এক নতুন সংবিধান—গভর্নমেণ্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫—পাস করেছে। জাতীয়তাবাদীরা বুঝলেন যে, বড় একটা চ্যালেঞ্জ এগিয়ে আসছে। বিশেষ করে বাংলা দেশের পরিস্থিতিটা ছিল খুবই জটিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের শাসকেরা যে ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা ছিল ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বলে যে ফরমুলাটি তাঁরা বাংলা দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন তার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমে আরও তিক্ত হয়ে উঠল এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ভাল করে লড়তে হলে কংগ্রেসে তখন একজন শক্তিমান পুরুষের দরকার ছিল।

অন্যদিকে বাবা ফিরেছেন খবর বেরোতেই হাইকোর্টে একটা প্রচণ্ড শোরগোল পড়ে গেল। মক্কেলরা ব্রীফের স্তূপ মাথায় করে উডবার্ন পার্কে ভিড় করলেন। খবরের কাগজে বেরোল, মিঃ বোস ফ্লাডেড উইথ ব্রীফস।

১৯৩৫-এর শেষে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে প্রথম বিয়ে লাগল। আমার দিদি মীরার সম্বন্ধ মোটামুটি ঠিক করে বাবা সোজা এলগিন রোডের বাড়িতে মা-জননীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বাবাকে দেখেই মা-জননী বললেন যে, তিনি সবেমাত্র স্বপ্নে দেখেছেন যে দাদাভাই গায়ের চাদর ও লাঠি নিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করতে দাদাভাই বললেন—অবশ্যই স্বপ্নে—যে তিনি মীরাবাঈয়ের জন্য বর দেখতে যাচ্ছেন। বাবা আশ্চর্য হয়ে মা-জননীকে জানালেন, তিনি তো বর দেখেই সোজা তাঁর কাছে এসেছেন। শুনে মা-জননী বাবাকে বললেন ঐ সম্বন্ধটাই পাকাপাকি করে ফেলতে। পরে আমাদের বড় ভগ্নীপতিকে অনেকেই 'স্বপ্নে পাওয়া জামাই' বলে অভিহিত করতেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাবা কিছু আধুনিকতা আনতে চাইলেন। বললেন, ভিয়েন বসিয়ে পাত পেড়ে খাওয়ানোটা সংক্ষেপে করতে হবে। তার বদলে টী-পার্টি হবে। এই প্রস্তাবে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে আপত্তি তুললেন—যেন শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাবে! যা-ই হোক, বাবা নিজের মতে অবিচল রইলেন। তবে কার্যত বাবার পাত পেড়ে খাওয়ানো ও টী-পার্টি দুটোই খুব বড় করে হল। টী-পার্টি থেকে বসু-বাড়ির মহিলা-মহলের অনেকে দূরে সরে রইলেন।

১৯৩৬ সালে বাবার উপর কংগ্রেসের

"প্যারীর একলেয়ার পেয়েছি ভাই—
সবার সেরা এই মিঠাই।"

মোড়ক খুলেই নতুন
আবিষ্কার—প্যারীর একলেয়ার্স !
প্রথমেই চাখো এ'র
পুরু আস্তরণ—যা মুখে লেগে
থাকে অনেকক্ষণ।
তারপর ভেতরটা—নরম,
কোকো ভরপুর
চকোলেটের স্বাদ।
আরো বেশী দুধ, আরো বেশী
চিনি···আরো বেশী মজা।

প্যারীর তৈরী
একলেয়ার
সবার সেরা একলেয়ার

Parry's

প্যারীজ
কন্‌ফেক্‌শনারী লিমিটেড
মাদ্রাজ

HTM-PCL-2199

কাজের চাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল। রাঙা কাকাবাবুর অনুপস্থিতেতে বাবাই বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সেই বছরে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হবে লখনৌতে—সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সময় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার রাজনীতি দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে এবং সাধারণভাবে বলা যায় জওহরলাল, রাঙা-কাকাবাবু ও কাকা এক পথের যাত্রী। রাঙা-কাকাবাবু ঠিক করলেন যে, তিনি লখনৌতে কংগ্রেসে যোগ দেবেন এবং মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দেশে ফিরে আসবেন। খবরটা প্রচার হয়ে যাওয়া মাত্র রাঙাকাকাবাবু ভিয়েনার ইংরেজ কূটনৈতিক প্রতিনিধির কাছ থেকে এই চিঠি পেলেন :

12th March 1936

I have today received instructions from the Secretary of State for Foreign Affairs to communicate to you a warning that the Government of India have seen in the press statements that you propose to return to India this month and the Government of India desire to make it clear to you that should you do so you cannot expect to remain at liberty.

J.W.Taylor
His Majesty's Consul

যেমন কথা তেমন কাজ। রাঙাকাকাবাবু সরকারের হুমকি উপেক্ষা করে এপ্রিলের গোড়ায় বোম্বাই বন্দরে পৌঁছনো মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

কংগ্রেসের সভাপতির কাজ তুলে নেবার পর ১৯৩৬-৩৭ সালে বেশ কয়েকবার পণ্ডিত জওহরলাল কলকাতায় সফরে আসেন। বাবার আমন্ত্রণে তিনি আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে উঠতেন। তিনি একতলার যে ঘরে থাকতেন সেটার নামই হয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতজির ঘর — পণ্ডিতজিকা কামরা। তাঁর ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ আকর্ষণ ছিল— আমরা তো তাঁকে দেখবার জন্য তাঁর ঘরের

কংগ্রেসের প্রচার-অভিযানে
একসঙ্গে শরৎচন্দ্র ও জওহরলাল

আনাচে-কানাচে ক্রমাগতই ঘোরাফেরা করতাম। তাঁর জীবনযাত্রার ধারাটা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু সব দিক দিয়েই ফিটফাট ও নিয়মমাফিক। তাঁর অতিবিনয়ী ও সদা-হাস্যময় সেক্রেটারি উপাধ্যায়জি একটি বিশেষ কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই ভোরে পণ্ডিত-জির ঘরে নিয়ে যেতেন। বাথরুমে জল গরম করবার গ্যাসের যন্ত্রটি আমাকে চালু করে দিতে হত। কী জানি কেন, পণ্ডিতজি হেসে বলতেন, ও কাজটা বড়ই গোলমেলে, আমি পারি না। সেই সময় প্রায়ই দেখতাম, পণ্ডিতজি মেজেতে একটি চাদর পেতে ব্যায়াম করছেন।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিতজি খুবই হিসেবি ছিলেন। বিদেশী ও দেশী দুরকম রান্নাই টেবিলে তাঁর জন্য দেওয়া হত। তিনি কিন্তু খুব বেছে অল্প খেতেন, গুরু-পাক খাদ্য মোটেই খেতেন না। মনে পড়ে, খাবার পর তাঁকে ফলমিষ্ট দেওয়া হয়েছে। আপেলটা বা সন্দেশটা ছুরি দিয়ে আধখানা করে অর্ধেকটা নিয়ে মুচকে হেসে বাকিটা আমাদের কারুর দিকে ঠেলে দিয়ে বলতেন,

আমাদের কথা

আমরা কেউ ভালবাসি রূপকথা, কেউ অ্যাডভেনচার, কেউ পড়ি

শিকার কাহিনী, কেউ কল্পবিজ্ঞান, কারো ভাল লাগে জীবনী, কারো পুরনো কলকাতা, কেউ চাই ছড়া আর কবিতা, কেউ

শিখতে চাই ছন্দ, কেউ বানান, কেউ মজে থাকি বিজ্ঞানের মজায়, কেউ ভূতের গল্পে, হাসির গল্প

ছাড়া ছুঁই না কেউ, কেউ গোয়েন্দাগল্প ছাড়া ছুঁয়েও দেখি না। আমাদের

নানান বয়েস, নানান রকমের পছন্দ; আর আমাদের সব-রকম

পছন্দের বই যাঁরা ছাপেন তাঁদের নাম

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৯ ফোন ৩৪৪৩৬২

'উইল ইউ হ্যাভ দি আদার হাফ?' সারাদিন খাটাখাটুনির পর রাত্রের খাওয়াটা তিনি খুবই হালকা রাখতেন—স্ক্র্যাম্‌বেলড ডিম ও কফি। হয়তো বাইরের কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পদ রান্নাও হয়েছে, সব দেখেশুনে হাসতে হাসতে বাবার দিকে চেয়ে বলতেন, 'শরৎ বোসের ডিনার ইজ্‌ এ ন্যুস্যান্স, ইট নেভার এনডস।' সিগারেট খেতেন গুনে গুনে। খাবার পর দুটি-একটি। মনে আছে, বাবা আমাকে পণ্ডিতজির জন্য ভাল বিলিতি সিগারেট—ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কিনতে দিয়েছেন—অতিথি-সৎকারে কোনো বাধা নেই। বহুদিন পরে ১৯৬০-এ দিল্লিতে পণ্ডিতজির সঙ্গে কাজে দেখা করতে গিয়েছি, দেখি একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন। বললাম, আপনি এত সিগারেট খাচ্ছেন কেন। আগে তো খেতেন না! উত্তরে বললেন, শুনেছি সুভাষ তো যুদ্ধের সময় চেন-স্মোকিং করত, তাই না? আমি সায় দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সিগারেট চলে নাকি?' আমতা-আমতা করে বললাম, 'মাঝে মাঝে চলে।' 'তাহলে চলুক না একটা—' বলে আমাকে একটা সিগারেট খাওয়ালেন। আরও বললেন, 'বোধহয় নানারকম স্ট্রেনের জন্য সিগারেট খাই, সুভাষও বোধহয় তাই করত।'

জওহরলালকে দেখবার জন্য উডবার্ন পার্কে কী ভিড়ই না হত! কংগ্রেসীদের ভিড় তো আছেই, তার উপর সব স্তরের সব বয়সের মানুষ ভেঙে পড়ত। তিনি ভিড় সামলাতে ভালই পারতেন, কিন্তু কখনও কখনও ধৈর্য হারাতেন ও রেগে যেতেন। দুটি জিনিস তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এক, দু'মিনিটের কাজ আছে বলে কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট করা। দুই, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা।

যখন কংগ্রেসের প্রচারে তিনি বেরোতেন, সারাদিনে প্রায়ই আঠারো-বিশটা সভায় বক্তৃতা করতেন। বাবা ও জওহরলালকে এক সঙ্গে বেশ কয়েকটা সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছি। পণ্ডিতজির গলায় জোর ছিল কম, মাইক না হলে চলত না। মীটিং করতে যাবার সময় গাড়িতে তাঁর জন্য ফ্লাস্কে ভরে গরম জল দেওয়া হত। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে তিনি জলে চুমুক দিতেন। (ক্রমশ)

ছবির মজা

চাকার ভিতর দিয়ে কুকুর পার করাচ্ছে সার্কাসের ক্লাউন। রঙ-পেনসিল বুলিয়ে ছবিটিকে রঙিন করবার আগে বলো, আরও কটি চাকা রয়েছে এখানে।

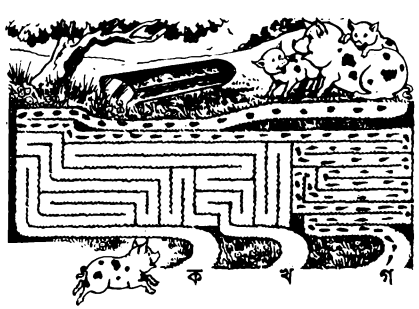

ছোট্ট শুয়োর কোন্‌ পথে বাড়ি ফিরবে?

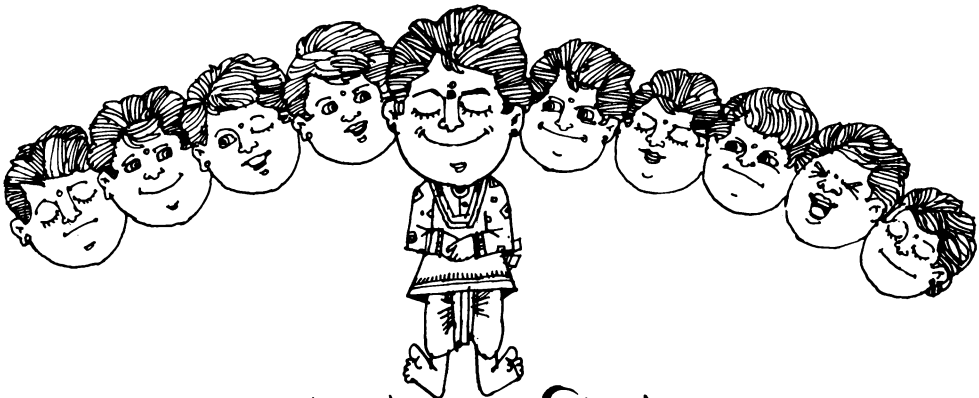

রাবণের ঘুম-শিক্ষা

মণীন্দ্র রায়

রাবণ রাজার দশটি মাথা,
বাচ্চা ছিলেন যখন
এক বিছানায় দশ বালিশে
হতেন নিদ্রামগন।

কিন্তু খোকার ঘুমের আগে
ভাবো মায়ের শান্তি
দশ মুণ্ডের বিশটি চোখে
ঐকমত্য নাস্তি।

মা-জননী শিয়রে তার
তদারকির চেষ্টায়
দশ জোড়া চোখ ঘুম পাড়াতে
হাঁপিয়ে পড়তেন শেষটায়।

মনে করো এক দুই তিন
এমনি জোড়ায়-জোড়ায়
চোখগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে
এলেন দশের গোড়ায়,

ততক্ষণে পয়লা জুটির
চোখের ঘুম তো কাবার,
পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থেকে
তাকায় তারা আবার।

কাজেই তখন দশম জোড়ায়
নিদ্রা এনে মাতা,
লেগে পড়লেন বন্ধ করতে
পয়লা জোড়ার পাতা।

তারপরে তো সোজা হিসেব
পয়লা যখন বন্ধ
ততক্ষণে দ্বিতীয় জোড়ার
কাটে ঘুমের ধন্ধ।

মাতা শেষে বুদ্ধি করে
খোকা রাবণটাকে
বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলেন
এরোপ্লেনের ডাকে।

সারাদিনই ঘুম সেখানে,
যেই সে-দেশে আসা
এক মিনিটেই ঘুমোয় খোকন
বিশ নয়নে খাসা।

অতঃপর আর বলব কী হে
ট্রেনিং পাওয়া অভ্যেস
দেশে ফিরেও রইল টিকে,
চলতে লাগল সব বেশ।

রণজিৎ

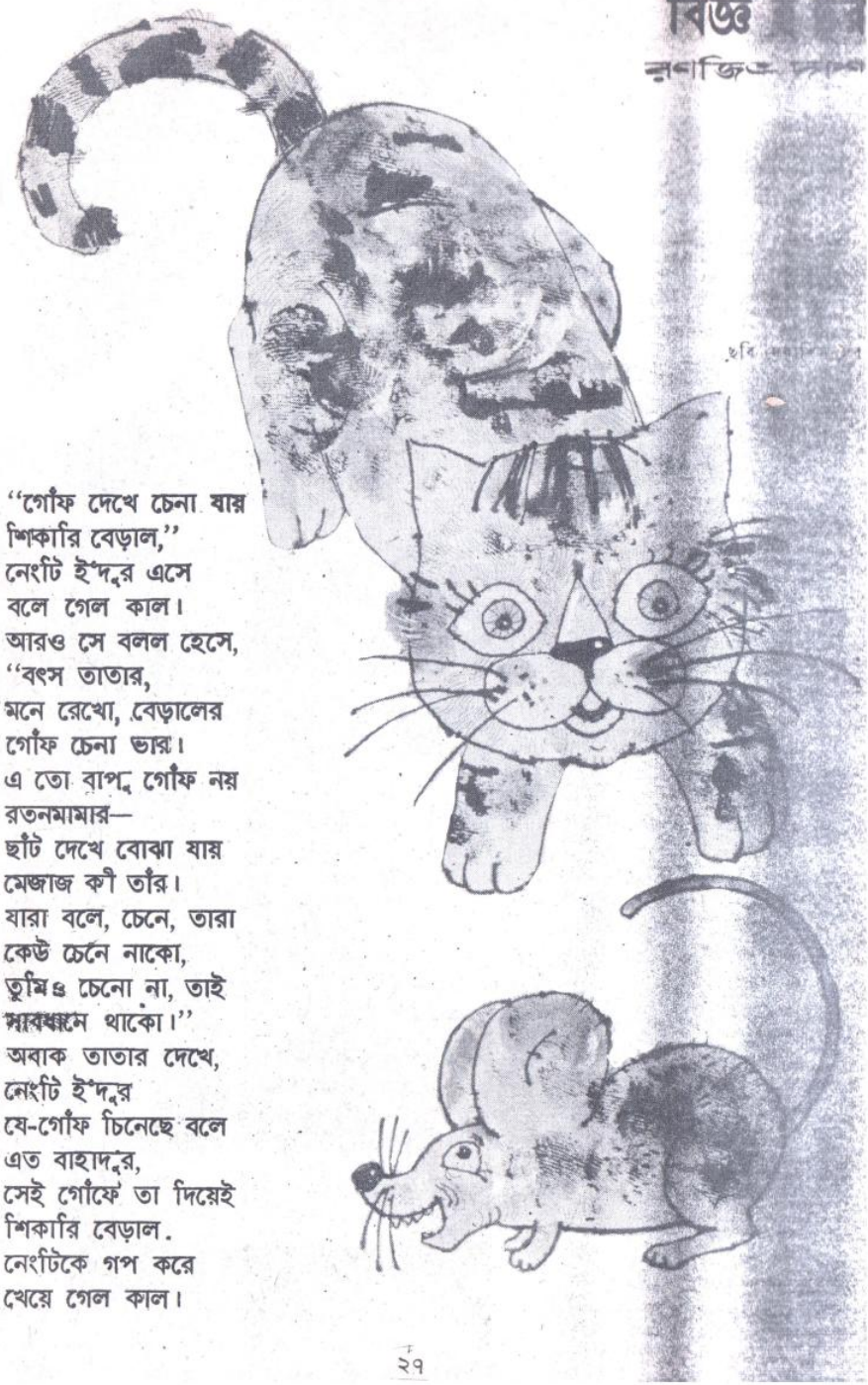

"গোঁফ দেখে চেনা যায়
শিকারি বেড়াল,"
নেংটি ইঁদুর এসে
বলে গেল কাল।
আরও সে বলল হেসে,
"বৎস তাতার,
মনে রেখো, বেড়ালের
গোঁফ চেনা ভার।
এ তো বাপু গোঁফ নয়
রতনমামার—
ছাঁট দেখে বোঝা যায়
মেজাজ কী তাঁর।
যারা বলে, চেনে, তারা
কেউ চেনে নাকো,
তুমিও চেনো না, তাই
সাবধানে থাকো।"
অবাক তাতার দেখে,
নেংটি ইঁদুর
যে-গোঁফ চিনেছে বলে
এত বাহাদুর,
সেই গোঁফে তা দিয়েই
শিকারি বেড়াল
নেংটিকে গপ করে
খেয়ে গেল কাল।

সদাশিব

অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য ঃ তরুণ মজুমদার
ছবি ঃ বিমল দাশ

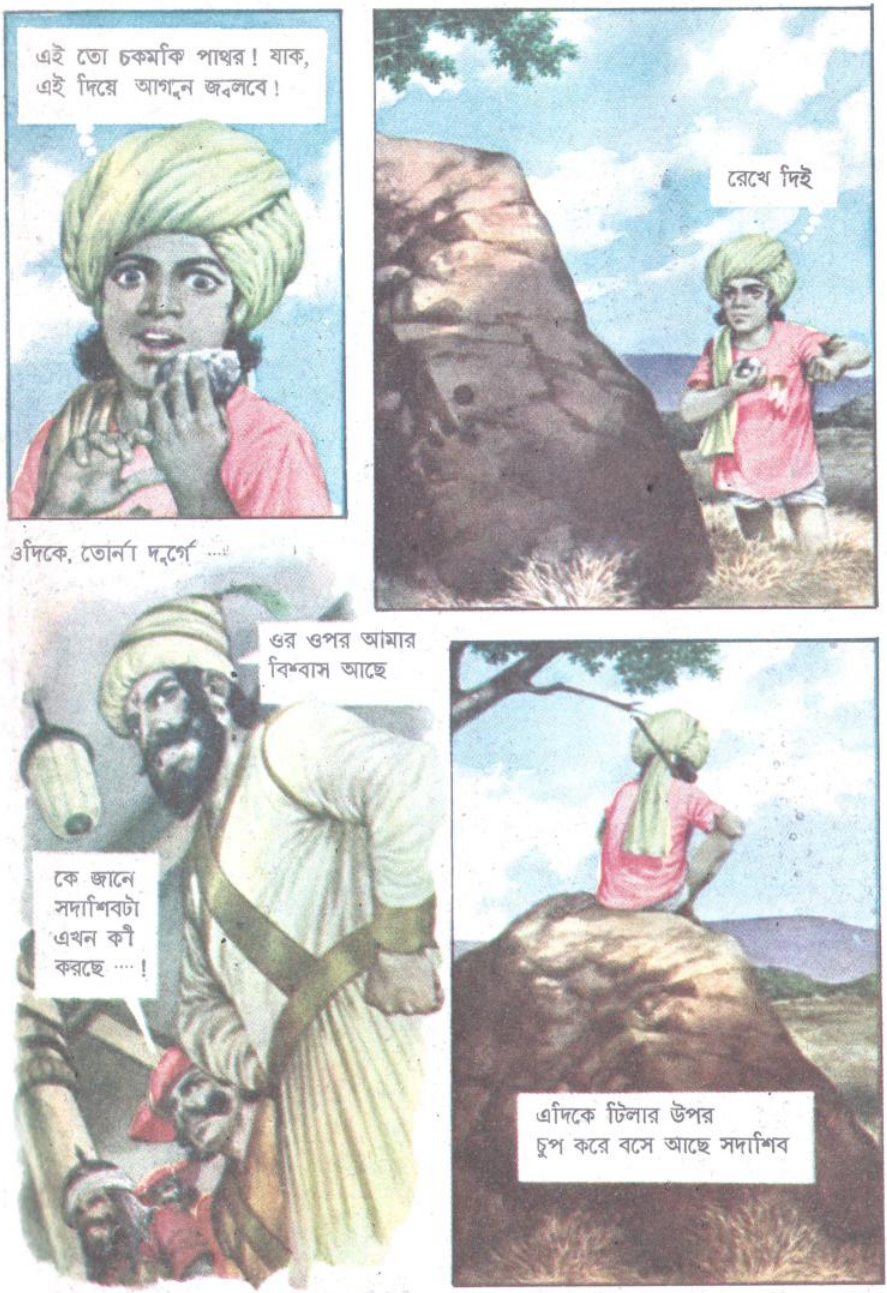

এমন সময়

ও কি!
—কিসের শব্দ?

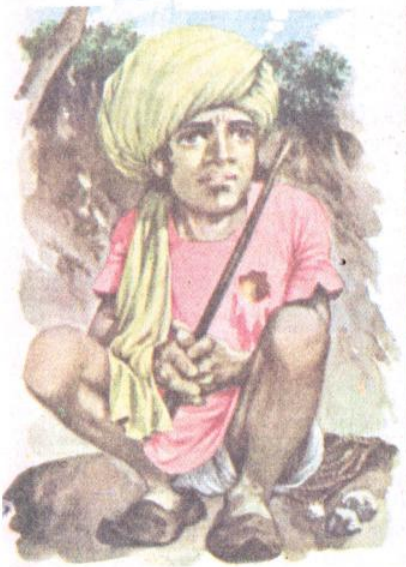

তাড়াতাড়ি উঠে দেখবার চেষ্টা করে সদাশিব

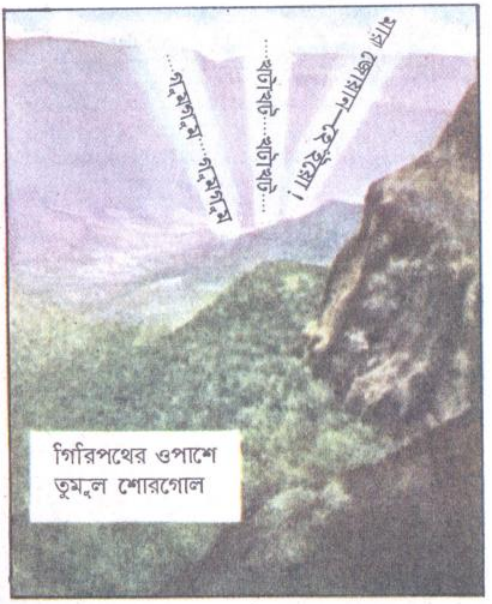

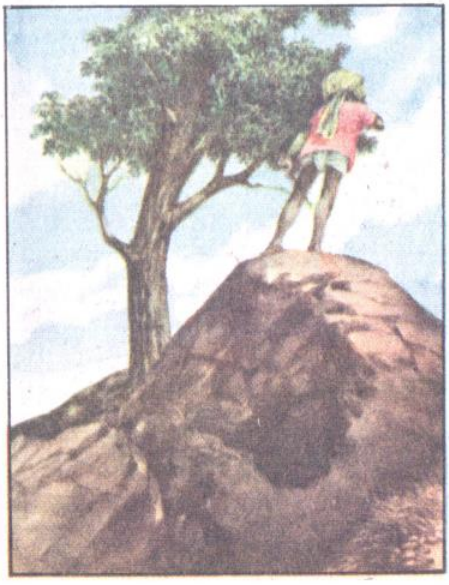

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনাল। শুরু হচ্ছে ব্রিটিশ টীম মেলচেস্টার ও ওলন্দাজ টীম আলখোভিনের লড়াই....
দুই দল মাঠে নামছে
পাশাপাশি হাঁটছেন দুই ক্যাপ্টেন রয় রেস আর যোহান সীগ্রান...
রয় আজ চিন্তিত....
এর আগে ইংল্যান্ড হল্যান্ড-কে হারিয়েছিল।
৫—১ গোলে জিতেছিলুম।
ওরা ভাবছে আজও আমরা আগের কৌশলে খেলব!
যা বলেছ!
কিন্তু আজ আমি কৌশল পালটাব! স্লেড আর গাইল্‌স ঠিকমতো খেললে হয়!
এবারে খেলা শুরু হবে........
আজ তোমাকে হারাব, রয়!
না হে, যোহান, অত সহজ নয়!
রয় থ্রু দিয়েছে!
ডান্‌ন এলিয়ট বল ধরবে!
এ তো সেই আগেরই কায়দা!

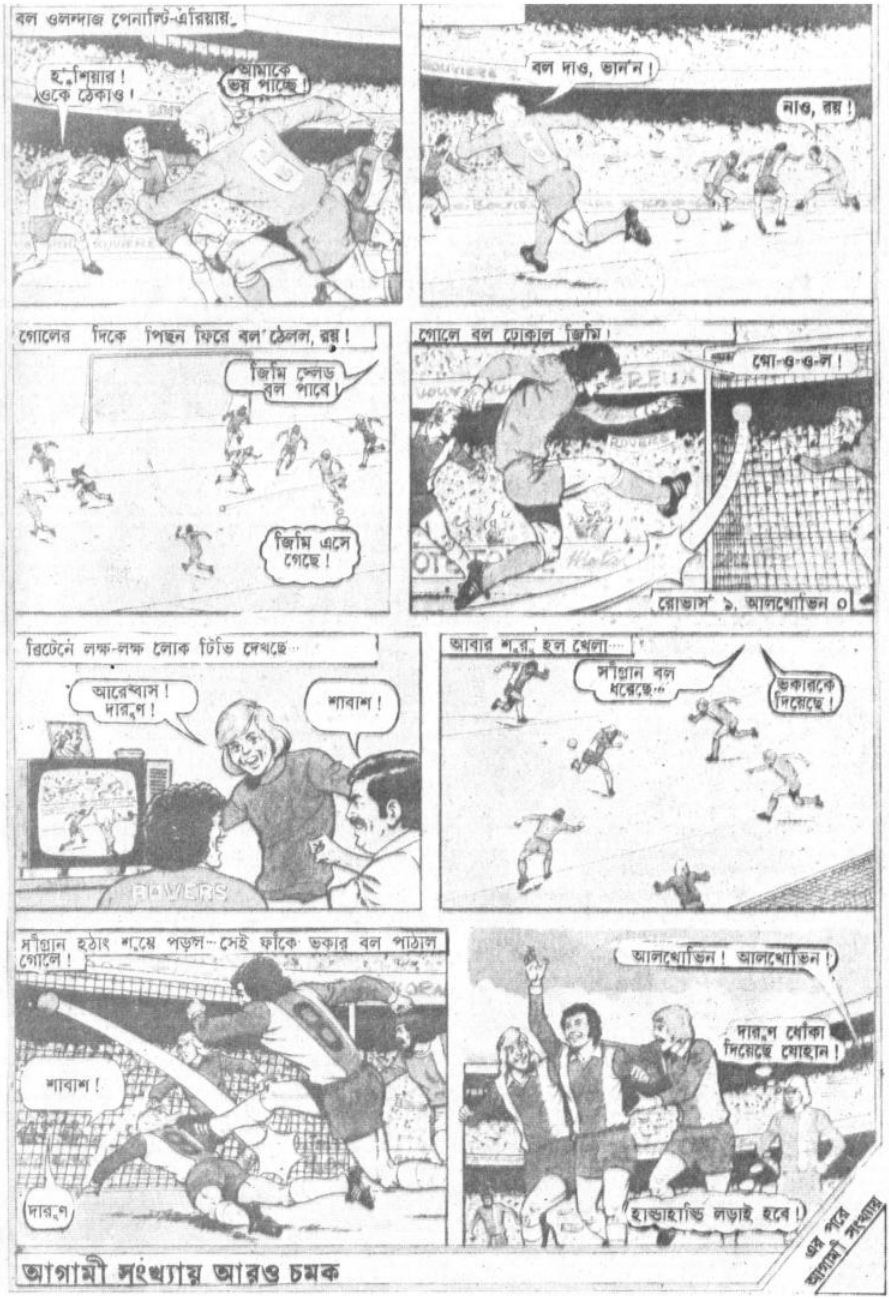

বল ওলন্দাজ পেনাল্টি-এরিয়ায়…
হুঁশিয়ার ! ওকে ঠেকাও !
আমাকে ভয় পাচ্ছে !
বল দাও, ভার্নন !
নাও, রয় !
গোলের দিকে পিছন ফিরে বল ঠেলল, রয় !
জিমি স্লেড বল পাবে !
জিমি এসে গেছে !
গোলে বল ঢোকাল জিমি !
গো-ও-ও-ল !
রোভার্স ১, আলখোভিন ০
ব্রিটেনে লক্ষ-লক্ষ লোক টিভি দেখছে…
আরেব্বাস ! দারুণ !
শাবাশ !
ROVERS
আবার শুরু হল খেলা…
সাঁগ্রান বল ধরেছে…
ভকারকে দিয়েছে !
সাঁগ্রান হঠাৎ শূন্যে পড়ল…সেই ফাঁকে ভকার বল পাঠাল গোলে !
শাবাশ !
দারুণ
আলখোভিন ! আলখোভিন !
দারুণ ধোঁকা দিয়েছে যোহান !
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে !
এর পরে আগামী সংখ্যায়
আগামী সংখ্যায় আরও চমক

পরদিন...
তোমরা মুক্ত। আমার লোকরা তোমাদের পাহাড়ের ওদিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।
আর-একটা অনুরোধ আছে আমাদের।

আমাদের দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী আপনারই অভিশাপে অসুস্থ। তাঁদের আপনি সুস্থ করে দিন।

তারা আমাদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছিল। তাই তারা শাস্তি পাচ্ছে।

আসলে কিন্তু আপনাদের প্রাচীন সভ্যতার মহিমার কথাই বাইরের জগৎকে জানাতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

বেশ, তাহলে দ্যাখো কীভাবে তাদের যন্ত্রণার উপশম হয়।

এই মূর্তিগুলো তাদের প্রতীক। মূর্তির গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছি। যন্ত্রণা থেকে এবার তারা মুক্তি পাবে।
মন্ত্রশক্তি! অবিশ্বাস্য! কিন্তু সেই স্ফটিকের গোলকের তাৎপর্য কী?

ওর মধ্যে থাকত ঘুম-পাড়ানো ওষুধ! ঘুমন্ত অবস্থায় তারা আমাদের মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হত।

আমাদের বিজ্ঞানীদের ঘুম-রোগ আর যন্ত্রণার রহস্যটা এবারে বুঝতে পারছি!
মূর্তিগুলো নষ্ট করে দাও!

সেই মুহূর্তে ইউরোপে
আরে, এখানে আমি কী করছি?

হাসপাতালে শুয়ে আছি কেন?

কার্লিং, কী হয়েছে আমাদের?
আমিও তাই ভাবছি সন্ডার্স।

রীডবাক, তুমি?
ক্লার্কসন! কী ব্যাপার?
আমি এখানে কেন?

পরদিন সকালে
আমরা তাহলে চলি, জোরিনো। আবার কখনো দেখা হবে।
বিদায়, টিনটিন!

বিদায়ের মুহূর্তে আমিও একটি অনুরোধ করব!
বুঝেছি। কিন্তু কোনো চিন্তা নেই...

সূর্য-মন্দিরের খোঁজ কাউকে আমরা দেব না।
আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, এ-ব্যাপারে আমি স্পীকটি নট্!

(এর পরে শুরু হচ্ছে নতুন কাহিনী : 'কালো সোনার দেশে')

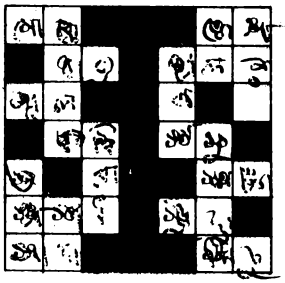

শব্দ-সন্ধান

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যে-ফল দেওয়ালেও ধরে। (৩) বাঘের শত্রু। (৫) পৃথিবী-বিখ্যাত তৈলশহর। (৬) প্রকৃতির রোষ। (৭) ছুঁচলো অস্ত্র। (৮) জীবনানন্দ যাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, সকলেই নয়, কেউ-কেউ। (১০) হালকা। (১৩) শ্রী যুক্ত হলেই পুরনো দ্বীপ নতুন। (১৪) অতীতের বিখ্যাত সাম্রাজ্য। (১৬) পাখিবিশেষ। (১৭) কালোর বিপরীত। (১৮) গ্রীষ্মের ফল।

উপর-নীচ : (২) যার বালকত্ব ঘোচেনি। (৩) ঠাণ্ডা পানীয়। (৪) অলংকার। (৬) সমুদ্রকীট থেকে উৎপন্ন মূল্যবান পদার্থ। (৯) রাম-কর্তৃক নিহত রাক্ষস। (১১) বন্ধ ঘরেও যেখান দিয়ে আলো আসে। (১২) রামায়ণে বর্ণিত নদী। (১৫) বিষ্ণুর হাতের একটি অস্ত্র।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

আ	দ	মি		বি	শা	খা
ত		গ	জ	ল		জা
শ	নি		রা		কা	ঞ্চি
	বে	ণু		ম	মি	
দা	শ		ঘা		নী	প
রো		মৈ	না	ক		য়া
গা	য়	ত্রী		লি	য়	র

ধাঁধা

"তোর সেই ধাঁধাটা মনে আছে?" ঘরে ঢুকতে না-ঢুকতে জিজ্ঞাসা করল ছোট্‌কা, "সেই টাকা ডবল করার ধাঁধাটা?"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকি, ভাববার চেষ্টা করি। হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বললাম, "সেই ম্যাজিকে টাকা ডবল করার ধাঁধাটা?"

"ম্যাজিকেই ছিল," ছোট্‌কা বলল, "আজ চোখের সামনে দেখলাম।"

ব্যাপারটা যে কী, ছোট্‌কা নিজেই বলল। আর যা বলল, সেটা নিয়েই এবারের ধাঁধা শুরু।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা লোক রাস্তায় বন্দুক আর গোল চাকতি নিয়ে টিপের বাজি ফেলছে। গোল চাকতিটা দূরে টাঙানো, তার মাঝখানে একটা চিহ্ন আঁকা। বন্দুক দিয়ে সেই চিহ্নে তাক করে গুলি ছুঁড়তে হবে।

পর পর তিনটে সুযোগ পাবে একজন। যত টাকা খুশি বাজি রেখে খেলা শুরু করা যায়। শর্ত হল, প্রত্যেকবার বন্দুক ছোঁড়ার পর দোকানদারকে ২৪ টাকা দিতে হবে, আর দোকানদারের পক্ষ থেকে সফল লোককে দেওয়া হবে বাজি-রাখা টাকার দ্বিগুণ অর্থ। অনেকেই চেষ্টা করছে। কেউ একেবারেই পারছে না, কেউ দু-একবার পারছে। যার যেমন পাওনা তাকে দিয়ে দিচ্ছে দোকানদার, নিজের পাওনা ২৪ টাকা হিসাবে কেটে নিচ্ছে।

একজন লোক পকেটের সব টাকা বাজি রেখে প্রথমবার বন্দুক ছুঁড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাজিমাত। লোকটার টাকা দ্বিগুণ হয়ে গেল। সে দোকানদারকে তার থেকে ২৪ টাকা দিয়ে বাকি টাকা বাজি রাখল। দ্বিতীয় দানেও অব্যর্থ টিপ। আবার টাকা দ্বিগুণ হল, দোকানি ২৪ টাকা নিল। তৃতীয়বারে লোকটি আগের মতোই ফেরত-পাওয়া টাকার সবটা বাজি রেখে বন্দুক ছুঁড়ল। আশ্চর্য ব্যাপার, এবারেও ঠিক নির্দিষ্ট চিহ্নে গুলি লেগেছে। লোকটি আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু আরও আশ্চর্য তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। শেষ দানেও দোকানি নিল ২৪ টাকা। কিন্তু সফল লোকটি এক পয়সাও ফেরত পেল না। হিসাবে কোনো ভুল নেই। প্রতিবারই লোকটির টাকা দ্বিগুণ হয়েছে, প্রতিবারই দোকানদার ২৪ টাকা করে কেটে নিয়েছে, কিন্তু তিন দানেই লোকটি ফতুর।

বলতে পারো, কত টাকা দিয়ে বাজি শুরু করেছিল এই অব্যর্থ-টিপ লোকটি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ তিন বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছে। হঠাৎ তারা আবিষ্কার করল যে, দু-বন্ধুই ব্যাগ ফেলে এসেছে। তৃতীয় বন্ধুর পকেটে কিছু টাকা ছিল। সে বলল, চিন্তা নেই, এই টাকাই তিনজনে ভাগ করে নেব।

একটা হোটেলে ঢুকে খেল তারা। মাথাপিছু চার টাকা করে দাম মিটিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল, তখন মোট যত টাকা অবশিষ্ট রয়েছে, তৃতীয় বন্ধুর টাকা ভাগ করে নিয়ে তারা একেকজন ঠিক তত টাকাই পেয়েছিল।

তৃতীয় বন্ধুর কাছে কত টাকা ছিল, যা তারা তিনজনে ভাগ করে নিয়েছিল সেদিন?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও

কপিপানাশি

চতুর্থ ধাঁধা ॥ কোন্ শব্দটা সবাই আমরা ভুল লিখি?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ২৫১৯টি কমলালেবু। (২) ১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪ ৩ ও ২—এই দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যাটি হল ২৫২০। (৩) আহ্লাদেও আটখানা হয়। (৪) ইংরেজিতে যখন BOX লেখা হয় তখনই OX থাকে বাক্সবন্দী হয়ে।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

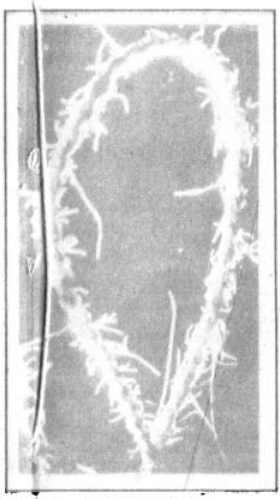

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল রাজহাঁসের জলপানের ফোটো

উত্তর বটে

প্রঃ এক ভদ্রলোকের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি গেছেন একজন মনোরোগচিকিৎসকের কাছে। চিকিৎসক প্রথমেই কী বলবেন?

উঃ ফী-টা আগাম নিয়ে রাখবেন।

প্রঃ সাঁতার কাটলে নাকি রোগা হওয়া যায়?

উঃ আমার বিশ্বাস হয় না। তিমি মাছ তো সব সময়ই সাঁতার কাটছে।

প্রঃ তুমি তো বলছ ক্রসওয়ার্ড পাজল করে অনেক প্রাইজ পেয়েছ, কিন্তু অফিসের কাজে চতুর হওয়া আর ক্রস-ওয়ার্ড করা কি এক জিনিস?

উঃ কেন নয় স্যার, আগে যেখানে চাকরি করতাম, সেখানে তো অফিসে বসেই ক্রসওয়ার্ড করতাম।

স্বসেন

মজার খেলা

এই খেলার জন্য চাই তিনটে খালি দেশলাই বাক্স অথবা তিনটে ছক্কা। এমন-কী তিনটে কাঁচা টাকা দিয়েও খেলাটা দেখানো যায়। আর চাই একটা স্কেল বা রুলার।

ধরা যাক, আমরা তিনটে ছক্কা দিয়েই খেলাটা দেখাব। ছক্কা তিনটে আর স্কেলটা নিয়ে আগেভাগে টেবিলে রেখে দাও। খেলার শুরুতে বন্ধুদের বলো, এসো, একটা খেলা খেলি।

এই বলে টেবিলের ওপর তিনটে ছক্কাকে দেড় ইঞ্চি মতন ফাঁক দিয়ে সাজাও। প্রথমে খুব স্বাভাবিকভাবে রাখো, এর পর একবার এ-হাতে একবার ও-হাতে ছক্কাগুলোকে সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে রাখতে থাকো। এই অংশটায় আসলে অভিনয় করছ তুমি, যেন প্রত্যেকটি ছক্কার মধ্যে সমান ব্যবধান রাখার জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত নেই, এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। চাইকি, একবার স্কেলটাকেও ব্যবহার করতে পারো, দুটো ছক্কার মধ্যের ব্যবধান মাপার জন্য। সাজানো হয়ে গেলে ছক্কাগুলো থাকবে নীচের ছবির মতন—

এবার কোনো বন্ধুকে প্রশ্ন করো, বলতে পারো—কোন্ দুটো ছক্কার মধ্যে দূরত্ব সব থেকে বেশি?

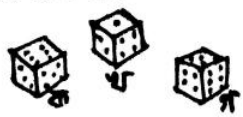

দেখবে এর উত্তরে বন্ধুরা হকচকিয়ে ভুল উত্তর দিয়ে ফেলবে। কেউ বলবে ক ও খ-এর মধ্যে, কেউ বলবে খ ও গ-এর মধ্যে। আসলে তো তা নয়, দূরত্ব সব থেকে বেশি দু-প্রান্তের দুটি ছক্কার মধ্যে অর্থাৎ ক ও গ-এর মধ্যে। তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে বকুলকে জিজ্ঞেস করল পিলু, "কী রে, কেমন পরীক্ষা দিলি?"

বকুল : খুব খারাপ। কিছু লিখতে পারিনি। খালি খাতা ফেরত দিয়েছি।

পিলু বকুলের কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "খুব ভাল করেছিস, আমিও কিছু লিখতে পারিনি। খালি খাতা দিয়ে এসেছি।"

"সে কী রে!" বকুল অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা মোটেই ভাল করিসনি। মাস্টারমশাই ভাববেন তুই আমার থেকে নকল করেছিস।"

টুবলুদের বাংলার প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে টুবলুর বাবা দেখলেন একটি প্রশ্নে পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখতে বলা হয়েছে। চারটি শব্দের পাশে দাগ দেওয়া, কিন্তু অমিল শব্দটির পাশে কোনো দাগ নেই দেখে বাবা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী টুবলু, অমিল শব্দের মানে জানো না

তুমি?" টুবলু বলল, "জানব না কেন? ইচ্ছে করে লিখিনি। অমিলের সঙ্গে আমার এক মাস কথা বন্ধ, ঝগড়া, মিছিমিছি ওর নামের মানে লিখতে যাব কেন?"

ছবি অহিভূষণ মালিক

বিদেশী এক ছোট্ট গাঁয়ে

মহাশ্বেতা চৌধুরী

তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত সব জায়গার গল্প শুনেছ, আমি বিদেশী একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামের কথা লিখতে বসেছি। গত গ্রীষ্মে আমরা সেখানে একটি দিন কাটিয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছিল। সেই ভাল-লাগার ভাগ তোমরাও একটু নাও-না।

ইংল্যান্ডের কান্ট্রিসাইড বা গ্রামাঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা অনেকেই জানে। ওখানকার বড় বড় শহরগুলোয় কিছুদিন থাকলে হাঁফ ধরে যায়। তখন দু-চার দিনের জন্য পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে গ্রামে। নদী, পুরনো গির্জা, মাইলের পর মাইল সবুজ প্রান্তর, মাঝে মাঝে খামার এমন সব গ্রামের নিশানা শহর থেকে মোটরওয়েতে যাবার পথে ছোট রাস্তা এঁকে-বেঁকে গেলেই মেলে।

ইতিহাসের এক বিখ্যাত অধ্যাপক আমাদের বিশেষ বন্ধু। তিনি অনেকদিন ধরেই তাঁর গ্রামের বাড়িতে যেতে বলছিলেন। উনি শুক্রবার বিকেলে ওখানে যান, লন্ডনে ফেরেন সোমবার সকালে। জুন মাসের এক রবিবারে যাওয়া ঠিক হল। লন্ডনের কিংসক্রস স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম। প্রায় ফাঁকা ট্রেন। সপ্তাহান্তে সবাই গাড়ি নিয়েই বেরোয়। বিরাট ঝকঝকে কাচের জানলায় আমরা দুধারের দৃশ্য উপভোগ করছি, একই রকম কটেজ ধরনের বাড়ি প্রায়ই চোখে পড়ছে। কোথাও গলাগলি করে দাঁড়ানো বাড়ির সারি, কোথাও বা আলাদা আলাদা ছোট ছোট দোতলা বাড়ি। সামনের বাগানে ফুলের স্মিত হাসি, ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, কোথাও বাবা-মায়েরা ওভারঅল পরে গাড়ি ধুচ্ছে বা মেরামত করছে। রোদ দেখে কেউ আবার দড়িতে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে। রোদে কাপড় শুকনো ওদেশে প্রায় বিলাসিতা। রোদ তো কেবলই পালিয়ে বেড়ায়; তাছাড়া সময়ের অভাবেও জামাকাপড়

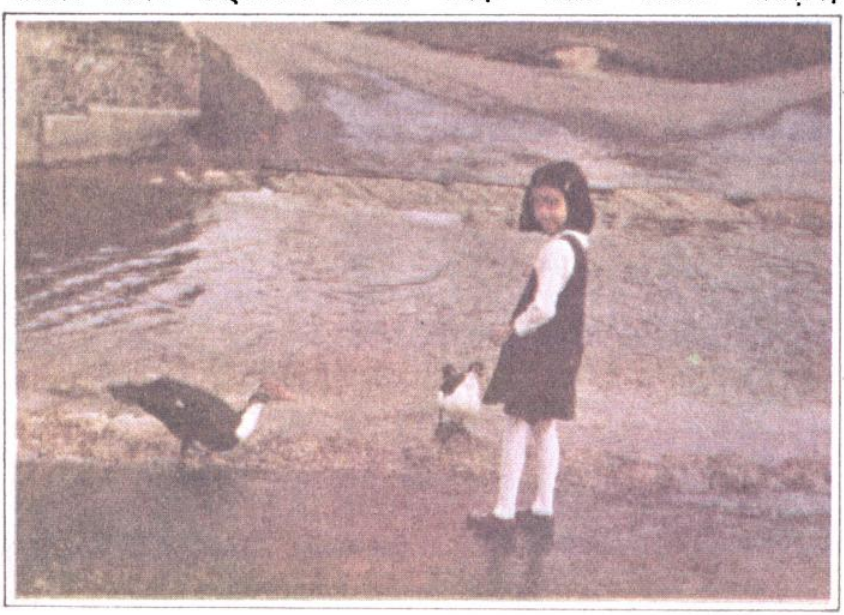

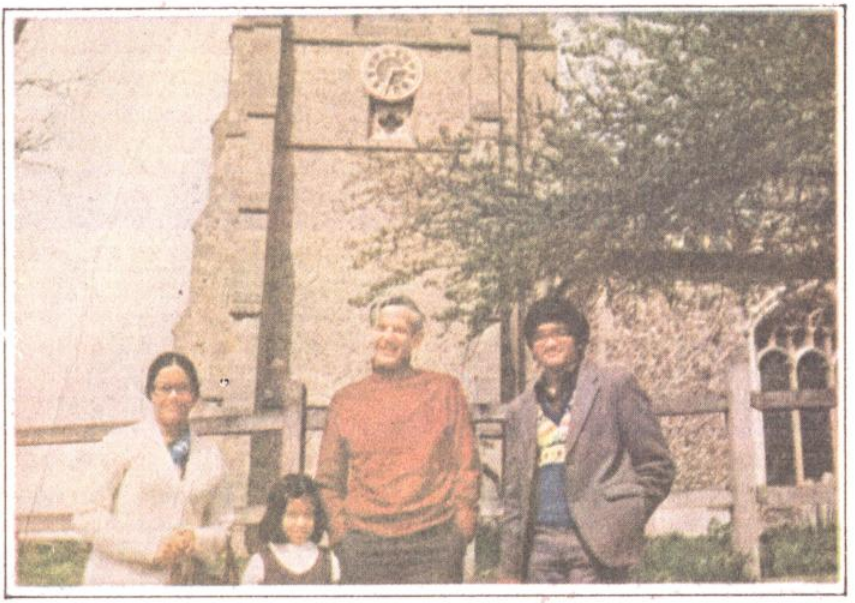

যন্ত্রেই শুকোতে হয়। বয়স্করা রোদে বসে আছেন। কোথাও কোন তাড়া নেই। কর্ম-চঞ্চল জীবন রবিবারের সকালে যেন হঠাৎ শান্ত। অলস বা কর্মহীন জীবনে এ আনন্দ অনুপস্থিত।

ট্রেন ছুটে চলেছে আমাদের গন্তব্য-স্থলের দিকে। স্টেশনগুলোও বড় মজার। ছিমছাম নির্জন আর পুরনো বলেই বোধহয় আমাদের দেশের ছোট ছোট স্টেশনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। একটাই তফাত শুধু—একেবারে ফাঁকা। অথচ রবিবার সকালেও আমাদের বালি, ব্যান্ডেল কি সোনারপুর স্টেশনে কী ভিড়ই না থাকে! নর্থ হের্টফোর্ড স্টেশনে আমাদের নামতে হবে। এটা লন্ডন থেকে প্রায় আশি-নব্বুই মাইল দূরে। এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগে। স্টেশনে শুধু আমরাই নামলাম। লোকজন বা দোকানপাট কিছু চোখে পড়ল না। অধ্যাপক পিটার মার্শাল গাড়ি নিয়ে আসবেন, কারণ গ্রামটি এখান থেকে আট মাইল দূরে। বাস বা অন্য যানবাহন নেই। আমাদের দেশের মতো রিকশা বা টাঙ্গার চল নেই এখানে। গ্রামের শান্তিভঙ্গ হবে বলে ভেতরে বাসরুট নেই। অধ্যাপক বন্ধুটি এসে পড়লেন। দু মিনিট দেরির জন্য বারবার ক্ষমা চাইলেন। সমস্ত রাস্তা শিশুর মতো প্রগল্‌ভতায় অজস্র কথা বলতে বলতে পরিচয় দিলেন দু'ধারের গাছ-পালা বাড়িঘরের। বিশাল বিশাল গাছের সারি দু ধারেই। মেপল, ওক, চেসনাট, বার্চ আরো কতরকম। গত কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডে বড় গাছের একরকম রোগ দেখা দিয়েছে যাতে মাইলের পর মাইল জুড়ে বহু গাছ ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো যাচ্ছে না। এদেশের প্রকৃতিপ্রিয় মানুষ তাতে বড় দুঃখিত। দীর্ঘ গাছগুলিকে বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। গ্রামের ছোট রাস্তায় বাঁক ঘুরতেই দু পাশে দেখলাম অনেক বাড়ি। কাল রাতেও বৃষ্টি হয়েছে, আজ সকালের উজ্জ্বল রোদ—যা এদের কাছে সোনার চেয়েও দামি। তকতকে বাড়িগুলোর গায়ে পড়ে ঝকঝক করছে। মানুষের মনেও রোদখুশির ছোঁয়া। অনেকেই বাগানে টেবিল পেতে খাওয়াদাওয়া করছে বা ঘাসের ওপর শুয়ে রৌদ্রস্নান করছে। পথে একটি গ্রামের নাম শুনলাম লিটল হ্যাডাম। অধ্যাপক জানালেন কাছেই আর-একটি গ্রাম আছে যার নাম মাচ হ্যাডাম।

মজার নাম না? আমাদের ছোটনাগপুর বা বুড়োশিবতলার মতো আর-কি! আরো একটা মজার ব্যাপার, বড় রাস্তায় মাঝে মাঝেই বড় বড় লাল অক্ষরে এখানে টাটকা স্ট্রবেরি পাওয়া যায় লেখা রয়েছে রাস্তার দু পাশে। খামারগুলোর বাইরে রাস্তার ওপর একটা ছোট ছাউনির তলায় ছোট ছোট সাদা বাক্সে লাল টুকটুকে ফলগুলো সবুজপাতাসুদ্ধ উঁকি মারছে। রাস্তার একপাশে হয়তো খামারের মালিক, অন্যপাশে তার বউ বা মেয়ে বিক্রি করছে দু ধারের গাড়ির আরোহীদের কাছে। আমরাও কয়েক বাক্স কিনলাম হাসিখুশি গ্রাম্য গিন্নিটির কাছ থেকে। টাটকা স্ট্রবেরিতে কামড় দিয়ে বুঝলাম লন্ডনে বড় বড় বাজার থেকে কেনা স্ট্রবেরি খুব একটা ভাল নয়।

গাড়ি গৃহকর্তার দরজায় এসে দাঁড়াল। অধ্যাপক আমাদের তাঁর কুটিরে নিয়ে গেলেন। এক সারিতে বেশ কয়েকটি একই ধাঁচের ছোট ছোট বাড়ি। কুটির বলা সত্যিই সাজে। কোনো আড়ম্বর কারুকার্য নেই। নিজের হাতে তৈরি এক টুকরো বাগানে ঘেরা। ইংল্যান্ডের অনেক গ্রামের মতো এই গ্রামটিও একেবারে সমতল নয়। কোথাও উঁচু, কিছুটা সমতল হয়ে কোথাও আবার একটু নিচু। ওঁর বাড়িটির পাশ দিয়ে আবার একটি ছোট্ট নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে, তার ওপর একটি ছোট্ট সাঁকো। জল কম থাকলে হেঁটেও পার হওয়া যায়। এই নদীটি পরমাকে দেখাবার জন্যই তিনি এত আগ্রহে আজকের আয়োজন করেছেন। গ্রামের নাম ব্রাফিং—অদ্ভুত নাম না? ভেতরে ঢুকেই ওঁর ছোট বসার ঘর, সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা। একদিকে অধ্যাপকের লেখাপড়ার জায়গা। অন্যদিকে ছিমছাম ছোট রান্নাঘর। বেশ গোছানো। মুরগির সুবাস বেরোচ্ছে বৈদ্যুতিক উনুন থেকে। সরু সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে দোতলায়, সেখানে একটি শোবার ঘর ও স্নানাগার। বাড়িটি বহুদিনের পুরনো, গোটা গাছের কাণ্ড দিয়ে কড়িবরগা। শুনলাম, এই ধরনের বাড়িগুলো অনেককাল আগে চাষবাসের সময় চাষিদের রাত্রিবাসের জন্য তৈরি হয়েছিল। এখন আধুনিকীকরণ হলেও পুরনো চিহ্ন যতদূর সম্ভব রাখা হয়েছে।

ঠান্ডা পানীয় দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করে অধ্যাপক কৌমরে অ্যাপ্রন জড়িয়ে রান্নাঘরে গেলেন। সাহায্য করতে গিয়ে দেখলাম যথেষ্ট পটুহাতে সব করেছেন—আনাড়িত্ব নেই এতটুকু। খাওয়ার পর আইসক্রীমের সঙ্গে নিয়ে এলেন একরাশ কাটা ফল। বললেন, "আমাদের খুব প্রিয় টাটকা ফলের স্যালাড।" অমূল্য সময় নষ্ট করে তিনি আমাদের জন্য সারা সকাল ধরে এত-সব আয়োজন করেছেন। কফি খাওয়ার ফাঁকে ওঁর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সমস্ত বাসনপত্র ধুয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে গ্রাম দেখতে বেরোলাম।

ওঁর বাড়ির প্রায় লাগোয়া সেই ছোট্ট নদীটি। সাদা-কালো হাঁস পেছনে তাদের শাবকবাহিনী নিয়ে খাবার দেখলে ছুটে আসছে। পরমা লন্ডন থেকে এক পাউন্ড রুটির টুকরো নিয়ে এসেছে, সেগুলো খাওয়ার জন্য হাঁসেরা প্রায় ওর হাতের কাছে চলে আসছিল। হাঁসগুলো কিন্তু পোষা নয়, ডিম পাড়ার সময় হলে আরো ওপরে নদীর মুখের কাছে চলে যায়। কিছুদিন পরে বাচ্চাকাচ্চা সমেত নীচে চলে আসে। নদীর ওপারটি একটু উঁচু, দুপারেই ড্যাফোডিল ফুটে আলো হয়ে আছে। সাঁকো পেরিয়ে আমরা ওপারে গেলাম গ্রামের ভেতরে যাওয়ার জন্য। অনেক কিশোর-কিশোরী সাইকেল নিয়ে ঘুরছে, এরা কেউই গ্রামের বাসিন্দা নয়। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছে। অবসরপ্রাপ্ত, বয়স্ক বা চাষবাস আছে যাদের তারাই বেশির ভাগ গ্রামে থাকে। বহু শিক্ষিত বা পদস্থ ব্যক্তিও অবসর নেওয়ার পর বা আগেও গ্রামে এসে চাষ-আবাদ শুরু করে দেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা মাঝে মাঝে দেখছিলাম ঘোড়ায় চড়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যাচ্ছে, খুদে মালিকদের মতো ঘোড়া-গুলিও প্রাণবন্ত। এরা সব বিভিন্ন খামারের ছেলেমেয়ে, তাদেরই ঘোড়া। যানবাহনের এত সুবিধা যখন ছিল না, ঘোড়া তখন এই সমস্ত বড় বড় খামারের কাজে একমাত্র বাহন ছিল। এখনও একটা সাইকেলের চেয়ে ঘোড়ার মতো তেজী একটা প্রাণীর মালিক হওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই বেশি আনন্দ আছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাঘের ক্ষমা

বাজি রেখে ভল্টেমামা
গেলেন বাঘ শিকারে,
গাদা বন্দুক কাঁধে নিয়ে
ওঠেন গাছে দুপুরে।
সন্ধে নাগাদ বাঘবাবাজি
আসেন হেলে - দুলে,
বাঘকে দেখেই ভল্টেমামার
চমকে ওঠে পিলে!
এমন সময় মড়মাড়িয়ে
ডালটা ভেঙে পড়ে,
ভল্টেমামা আছড়ে পড়েই
বসেন হাঁটু গেড়ে!
ক্ষমা চেয়ে প্রাণের দায়ে
মামা মরেন কেঁপে,
বাঘটা তাকে ক্ষমা করে
অবোধ শিশু ভেবে।

লিপিকা দত্ত (বয়স ১৫)

ফুলের কথা

দুটো ফুল। একটা ফুল নীল, একটা ফুল সাদা। হাজার বছর আগে একটা বাঘ বিষ খেয়েছিল, তারপর একটা পদ্ম ফুলকে চেটেছিল. ফুলটা নীল হয়ে গিয়েছিল।

হাজার বছর আগে একটা সিংহ দুধের পুকুর থেকে অনেক দুধ খেয়েছিল, তারপর একটা গোলাপ ফুলকে চেটেছিল, ফুলটা সাদা হয়ে গিয়েছিল।

সেই ফুলেদের সঙ্গে ফুলপরীদের ভাব ছিল। ফুলগুলো যখন ঝরে যেত তার পাপড়ি দিয়ে ফুলপরীরা আবার নতুন ফুল তৈরি করত। ফুলগুলো এইভাবে বেঁচে রইল।

লোকেরা পুজার জন্যে ফুল তুলতে এলে তারা লুকিয়ে পড়ত। লোকেরা তখন গাছের পাতা দিয়ে পুজো করত। এরপর ফুলেরা সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

শুভায়ন বসু (বয়স ৭)

মধ্যিখানে

বাবার বাড়ি
কাকার বাড়ি
মধ্যিখানে পুকুর
মাসির বাড়ি
পিসির বাড়ি
যেতে হলে দুপুর।

নুপালি বিশ্বাস (বয়স ৯)

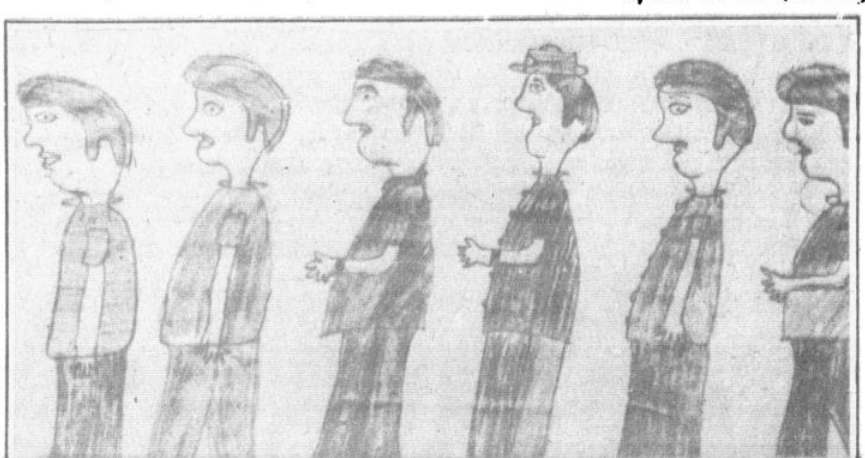

ছবি এঁকেছে **দীপ্তা পাল** (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে **সাবর্ণি চট্টোপাধ্যায়** (বয়স ৯) ৪০

লেন প্যাসকো
অস্ট্রেলিয়ার নতুন ফাস্ট বোলার
ফোটো রাহুল গুপ্ত

ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করছেন উরুগুয়ের ভিস্তোরিনো

দক্ষিণ আমেরিকাই শীর্ষে

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

কাউকে ঈর্ষা করাটা খুব খারাপ। সে কথা জানি। কিন্তু তবু না করে পারিনি—হাজার-সত্তর দর্শকের প্রত্যেককে, যারা সম্প্রতি-মন্টিভিডিওর (উরুগুয়ে) সেন্টিনারও স্টেডিয়ামে গোল্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা সাতটি দেখতে পেয়েছেন।

এ-প্রতিযোগিতা ছিল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির স্মারক।

প্রথম প্রতিযোগিতা হয়েছিল উরুগুয়েতে ১৯৩০ সালে। তাই সেখানেই স্মারক প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতাটিতে খেলার অধিকার ছিল বিশ্বকাপজয়ী দেশগুলির। ছটি দেশের মধ্যে ১৯৬৬-র বিজয়ী ইংল্যান্ড আসতে পারেনি, কারণ সেখানকার সেরা দলগুলি মরসুমের মাঝখানে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের ছাড়তে চায়নি। (ইংল্যান্ডের জায়গায় নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এর রানার্স হল্যান্ডকে।) বাকি পাঁচটি বিশ্বকাপজয়ী দেশই খেলেছিল—তিনবারের বিজয়ী ব্রাজিল, চলতি চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবং উদ্যোক্তা উরুগুয়ে (১৯৩০, ১৯৫০) ছাড়া দুবার করে আর যে দুটি দেশ জিতেছে—ইতালি (১৯৩৪, ১৯৩৮) ও পশ্চিম জার্মানি (১৯৫৪, ১৯৭৪)। প্রতিযোগিতাটিকে সেইজন্যই অনেকে বলেছেন মিনি ওয়ার্ল্ড কাপ। মনে হয়, হল্যান্ড খেলেছে বলেই 'ওয়ার্ল্ড কাপ' বলা যায়নি।

খবরের কাগজের পাতায় প্রতিযোগিতাটি বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো প্রচার না পেলেও এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। উরুগুয়ে ও ইতালি দুটি দেশই দেখাতে চেয়েছিল যে তারা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। উদ্যোক্তা দেশ নিজের লোকেদের সামনে কিছুতেই হারতে চায় না। তা ছাড়া অনুশীলনী ম্যাচে ফিনল্যান্ডকে ৬—০ গোলে, বলিভিয়াকে ৫—০ গোলে ও সুইজারল্যান্ডকে ৪—০ গোলে হারানোর পরে ফুটবল-পাগল উরুগুয়েবাসী সঙ্গতভাবেই রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন। এবং ইতালি? তাদের গর্ব ১৯৭৮-এর প্রতিযোগিতায় একমাত্র তারাই আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছে। বলা বাহুল্য, গ্রুপের খেলায় তিন-তিনবারের বিশ্ববিজয়ী ব্রাজিলের কথা আলাদা। ১৯৭৮-এর প্রতিযোগিতার একমাত্র অপরাজিত দল বলেই নয়। যেভাবে ব্রাজিলকে টপকে আর্জেন্টিনা ফাইনালে গিয়েছিল, সেটা সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। যে পেরু নিজের গ্রুপে অপরাজিত অবস্থায় শীর্ষে ছিল, তাকে ৬—০ গোলে হারিয়ে গোল-পার্থক্যের জোরে আর্জেন্টিনা বেরিয়ে গিয়েছিল সেবার। পশ্চিম জার্মানি বর্তমানে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন। সুতরাং তাদের কাছেও গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার গুরুত্ব কম ছিল না। তা-ছাড়া, ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপে অস্ট্রিয়ার কাছে ২—৩ হারার পরে তারা টানা তেইশটি আন্তর্জাতিক খেলায় হারেনি।

একবারও বিশ্বকাপ না পাওয়া হল্যান্ডের দায়ও কম ছিল না। কাপ না পেলে কী হবে, জগৎকে 'টোটাল ফুটবল' উপহার দিয়ে হল্যান্ড বহুজনের হৃদয়ে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নের আসনটি দখল করে নিয়েছে। এ-ছাড়া তারা যে অন্তত ইউরোপে দ্বিতীয় সেরা দল সেটা প্রমাণ করার প্রয়োজনও তাদের ছিল—বিশেষত ১৯৮২-এর বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় আয়ার্ল্যান্ডের কাছে ডাবলিনে ১—২ গোলে ও বেলজিয়ামে ০—১ গোলে হারের পর। এবং গতবারের বিজয়ী আর্জেন্টিনার কাছে গোল্ড কাপ ছিল সম্মানের অগ্নিপরীক্ষা। তারা যে বিশ্ব-খেতাবের যথার্থ অধিকারী, ১৯৮২-র আগে সেটা প্রমাণিত করার এটাই ছিল প্রকৃষ্ট সুযোগ।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে জিতল উদ্যোক্তা দেশ উরুগুয়ে। এ-রকম একটা প্রতিযোগিতায় জিতে উরুগুয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই যে সারা রাত (১০—১১ জানুয়ারি) রাস্তায় পতাকা হাতে নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় করেছে, পটকা ফাটিয়েছে, বাজি পুড়িয়েছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল 'চিরশত্রু' ব্রাজিল। ১৯৫০-এর বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের মতো গোল্ড কাপ ফাইনালেও একই ফল হল উরুগুয়ের অনুকূলে ২—১। তবে তফাতের মধ্যে সেবার মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল এগিয়ে গিয়েছিল, এবার উরুগুয়েই। অনেকেই আশা করেছিলেন, ব্রাজিল ১৯৫০-এর শোধ নেবে, কিন্তু তা আর হল না। অবশ্য এ-আশা অযৌক্তিক ছিল না। ব্রাজিল দারুণ খেলে পশ্চিম জার্মানিকে ৪—১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে গিয়েছিল।

প্রতিযোগিতার এ গ্রুপে ছিল উরুগুয়ে, হল্যান্ড আর ইতালি, বি গ্রুপে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল এবং পশ্চিম জার্মানি। ছটি দেশের তিনটি ইউরোপের, তিনটি দক্ষিণ

আমেরিকার। ৩০ ডিসেম্বর উদ্বোধনী খেলায় হল্যান্ডকে ২—০ গোলে এবং চারদিন পর একই ব্যবধানে ইতালিকে হারিয়ে উরুগুয়ে যখন ফাইনালে যায় তখন ব্রাজিল খেলাই শুরু করেনি। অবশ্য আর্জেন্টিনা পশ্চিম জার্মানিকে ২—১ গোলে হারিয়েছিল। ব্রাজিল প্রথম খেলায় আর্জেন্টিনার সঙ্গে ১—১ করায় তাদের ফাইনালে যাবার আশা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়, কারণ গোল-পার্থক্য আর্জেন্টিনারই অনুকূলে ছিল। কিন্তু পরের খেলায় এক গোলে পিছিয়ে থেকেও ব্রাজিল পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার আশায় বাদ সেধেছে।

আর্জেন্টিনার কোচ সিজার লুই মেনত্তি তো রেগেই আগুন। সোজাসুজি না বলতে পেরে ইঙ্গিত করেছেন—পশ্চিম জার্মানি ব্রাজিলকে সুযোগ দিয়েছে বেশি গোল করার। তিনি বলেছেন, "সারা মাঠ জুড়ে পরিশ্রম করে মার্কিং করে খেলার জন্যে যে জার্মানদের এত খ্যাতি ছিল তারা হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে মিইয়ে গিয়ে ভিতুর মতো জোনাল ডিফেন্স করতে শুরু করল—যাতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেশি সময় ও জায়গা পায়!" সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, "আমি জার্মানদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনছি না। এটা হল বিবেকের ব্যাপার। আর্জেন্টিনার বিবেক পরিষ্কার। কিন্তু জার্মানরা সেই দাবি করতে পারবে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

অদ্ভুত যুক্তি! আর্জেন্টিনা পশ্চিম জার্মানিকে হারালে সেটা স্বাভাবিক আর যে-ব্রাজিল গত বিশ্বকাপে (০—০) এবং এই গোল্ড কাপে (১—১) আর্জেন্টিনার সঙ্গে সমানে সমানে খেলেছে তারা হারালে সেটা সন্দেহের ব্যাপার হয়! তবু যদি না আর্জেন্টিনা-পেরুর ১৯৭৮-এর খেলাটিতে ৬—০ ফল হত!

মেনত্তির ক্ষোভের কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। কাগজে-কলমে তাঁর দলই সেরা ছিল। দলে . ছিলেন মারিও কেম্পেস, দানিয়েল বার্তোনি, অসওয়াল্দো আর্দিলেস আর দিয়েগো মারাদোনার মতো বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়রা। কুড়ি বছর বয়সী মারাদোনাই এখন বিশ্বের সবচেয়ে নামী ও দামি (বাজার দর সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার মতো) খেলোয়াড়। অনেককে অনেকবার 'নতুন পেলে' বলা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে মারাদোনাকে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা হলে কী হবে, মারাদোনা নাকি দু দুবারের ইউরোপীয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার "কেভিন কীগানের চাইতেও বেশি দ্রুত ও শক্তিশালী এবং আরও ভাল বল কনট্রোল করতে ও বেশি ফুটবল বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন।" কেম্পেস, বার্তোনি ও আর্দিলেস বিদেশে খেলেছিলেন। অনেক আশা নিয়ে মেনত্তি তাঁদের ফিরিয়ে এনেছিলেন গোল্ড কাপে খেলার জন্যে।

সেই তুলনায় পশ্চিম জার্মানি পুরো শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। কার্ল-হাইনেজ রুমানিগা, কার্ল-হাইনজ ফস্টার ও ক্লস অ্যালফস খেলেছেন ঠিকই, কিন্তু স্প্যানিশ ক্লাবরা না ছেড়ে দেওয়ায় বার্নড সুস্তার ও উলি স্টিলকে দেশের হয়ে লড়তে পারেননি। রুমানিগা এবার (ইউরোপীয়ান) ফুটবলার অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন—গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা চলার মাঝপথেই।

কিন্তু গোল্ড কাপে কার্যক্ষেত্রে নামীদের চেয়ে কম নামী ও অনামীরাই নজর টেনেছেন বেশি। বিশেষত, মাঝমাঠের দুই খেলোয়াড়—উরুগুয়ের রুবেল প্যাজ ও ব্রাজিলের টোনিনহো সেরেজো।

বিশ্ব-ফুটবলের যে কোনও প্রতিযোগিতায় ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটি কোনও না কোনও ভাবে উপস্থিত হয়ে থাকেই। গোল্ড-কাপ জিতে উরুগুয়ে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাধান্যই বজায় রাখল।

ঈর্ষার কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। তাই দিয়েই শেষ করি। উরুগুয়ের অধিনায়ক ওয়ালদেমার ভিক্টোরিনোকে নিশ্চয়ই মনে মনে আর সব খেলোয়াড় ঈর্ষা করেছেন—শুধু ফাইনালে জয়সূচক গোলটি করার জন্যেই নয়, তিনটি খেলার প্রতিটিতেই তিনি একটি করে গোল করেছেন। আমি তো তবু আমার ঈর্ষাবোধের কথা সোজাসুজি বলেছি!

রিক চার্লসওয়ার্থ

হকিতে হল্যাণ্ড

অলোক দাশগুপ্ত

হকিতে শক্তিশালী দেশগুলি মস্কো অলিম্পিক বয়কট করায় প্রায় ফাঁকা ময়দানে বাজিমাত করে ভারত। বিশ্বশ্রেষ্ঠ কে—সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। এই কারণে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানের করাচি শহরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় চ্যাম্পিয়নস' ট্রফির গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। নাম থেকে বোঝা যায় প্রতিযোগিতাটি একেবারে সামনের সারির দলগুলির জন্য। শেষ মুহূর্তে ভারত সরে দাঁড়ানোয় পাকিস্তান, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, স্পেন এবং গ্রেট ব্রিটেন অংশ নেয়।

সাতদিনের টুর্নামেন্টের প্রতিটি খেলা হয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। হলপ করে বলা যায়নি কে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। এর থেকে প্রমাণিত হয়েছে হকির শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে মানের পার্থক্য উনিশ-বিশ।

পাঁচটি খেলায় আট পয়েন্ট পেয়ে হল্যাণ্ড অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তিয়াত্তরে আমস্টার্ডামে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এটাই তাদের বড় রকমের সাফল্য—তার থেকে অবশ্য বড় কথা পাকিস্তানের মাটিতে গত দুই বছরের অপরাজিত দল পাকিস্তানকে হারিয়ে তারা এই খেতাব জিতেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনকেও তারা পরাজিত করেছে ; ড্র হয়েছে পশ্চিম জার্মানি এবং স্পেনের সঙ্গে।

হল্যাণ্ডের জয়ে মুখ্য ভূমিকা পেনাল্টি কর্নার স্পেশালিস্ট পল লিট্‌জেনের। প্রতিটি ম্যাচে গোল করে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন। শোনা যাচ্ছিল লিট্‌জেন আন্তর্জাতিক হকি থেকে অবসর গ্রহণের কথা ভাবছেন। কিন্তু ভারতীয় হকি-প্রেমীদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। লিট্‌জেন জানিয়েছেন, আগামী শীতে বোম্বাইয়ের বিশ্ব কাপে তিনি অংশ নেবেন।

স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতার শুরুতে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানই ছিল হট্‌ ফেবারিট। কিন্তু তারা তেমন সুবিধে করতে পারেনি, কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেছে হল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে। মুনওয়ার-উজ-জামান এবং মনজুর-উল-হাসানের অভাব পাকিস্তান বেশ অনুভব করেছে। ওঁরা দু'জন সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। হকি এবং ক্রিকেটের "ডবল ইণ্টারন্যাশনাল" রিক্‌ চার্লসওয়ার্থের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া এই প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ। ক্রম-পর্যায়ে তারপরে স্থান পশ্চিম জার্মানি, পাকিস্তান, স্পেন এবং গ্রেট-ব্রিটেনের।

ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ না নেওয়ায় ক্রীড়ামোদী মাত্রই নিরাশ হয়েছেন। অন্তত মস্কোয় ভারতের জয় যে ফাঁকা মাঠে বন্দুক চালানো নয়, তা প্রমাণ করার সুযোগ থেকে ভারত নিজেকে বঞ্চিত করল। ভারতীয় খেলোয়াড়রা হারালেন বিশ্বশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এক সুবর্ণ সুযোগ—নবীন খেলোয়াড়দের দিয়ে গড়া ভারতীয় হকি দলের এই অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

সবাই আশা করেন বোম্বাই বিশ্বকাপে ভারত ভাল ফল দেখাবে। জানি না সেটা কী করে সম্ভব হবে। আগামী এক বছরে ভারতীয় হকি দল বিদেশী দলগুলির সঙ্গে খেলার কতটুকু সুযোগ পাবে? অন্যান্য দেশের খেলার মান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা না থাকলে আন্তর্জাতিক আসরে সফল হওয়া কি সম্ভব?

বাংলা কেন হারল

বজ্রসেন

না, গৌতম সরকারের 'পেনাল্টি' শট নয়, বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীই বুঝি বা সেদিন রৌরকেল্লার ইস্পাত স্টেডিয়ামের ক্রস-বারে মাথা-কুটে কেঁদে ফিরে গিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, ৩৭তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় (যাতে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব বিজয়ী হয়েছে) বাংলা ও রেলের দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনালের কথাই বলছি। ১৮ জানুয়ারির ঐ খেলাতেই টাই-ব্রেকারে ২—৩ গোলে হেরে 'তারায় তারায় খচিত' বাংলার সন্তোষ ট্রফিতে ডাবল হ্যাটট্রিক করার স্বপ্নটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ওড়িশার ধুলোয় মিশে গেল। স্টেডিয়ামের ড্রেসিং রুম থেকে মাথা নিচু করে বেরুবার সময় বাংলার অনেক খেলোয়াড়ই মনে-মনে ভাবলেন, ওড়িশা বাংলা ফুটবল দলের ওয়াটার্লু হয়েই রইল ১৯৬৭-তে সেখানে বাংলা ফাইনালে হেরেছিল কর্ণাটকের কাছে।

কিন্তু কেন এই পরাজয়? ভারতের ফুটবল-প্রতিভার সারাংশ নিয়ে তৈরি বাংলা শুধু কাগজে-কলমে নয়, বাস্তবেও দেশের সেরা দল। বিরাশির এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল গড়ার উদ্দেশ্যে প্রথম কোচিং ক্যাম্পে যে ৬২ জন ডাক পেয়েছে তার মধ্যে বাংলারই আছে ২৪ জন। আর ঐ ২৪ জনের মধ্যে ১৮ জনই বাংলার হয়ে কটকে ও রৌরকেল্লায় খেলে এসেছেন। তাহলে?

সহজ উত্তরটা একটা শিশুও দিতে পারে। বাংলা ভাল খেলেনি, তাই জেতেনি। কিন্তু অনেকেই নির্দ্বিধায় ঐ উত্তর মানতে রাজি হবেন না। বলবেন, যে-দল প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১৮টি গোল করেছে, একটিও খায়নি, তারা .....

হ্যাঁ, ঐ পর্যন্তই। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ থেকে শুরু করে বাংলা কী খেলেছে? গোয়ার কাছে হেরে (০—১) সেমিফাইনালে যাওয়ার ব্যাপারটাই অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধ্রকে (২—১) ও ওড়িশাকে (১—০) কোনক্রমে হারিয়ে 'রেলে চাপা' পড়ল (০—০, ০—০ টাইব্রেকারে ২—৩) সেমিফাইনালে। অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে তিনটি গোল করে দু'টি খেয়েছে। সেমিফাইনালের দুটি খেলায় একটি গোলও করতে পারেনি। জানি না প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্যে বাংলার ছেলেদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল কিনা।

আসলে ভাল না-খেলার মূলে যেটার অনুপস্থিতি এবার বাংলার খেলায় পদে-পদে দেখা গেছে, তা হল দলগত সংহতি তথা পারস্পরিক বোঝাপড়া। বাংলা একটি দল হয়ে এবার খেলতে পারেনি।

সংহতি তো আর আপনা-আপনি আসে না। তাকে আয়ত্ত করতে হয় অনুশীলনের মাধ্যমে। বাংলা দলের সব খেলোয়াড় কি একটি দিনও একত্র অনুশীলন করেছে, যেমনটি রেলের ছেলেরা এক মাস করেছে?

কিন্তু ভাল না-খেলেও তো জেতা যায়। দুনিয়ার সমস্ত বিজয়ী দলই ভাল খেলে জেতেনি বা জেতে না। বাংলার ক্ষেত্রেও তা হতে পারত। যদি.....

হ্যাঁ, ঠিক এইখানটাতেই ভাগ্যের প্রয়োজন হয়। মানি, সাফল্য হল নিরানব্বই ভাগ চেষ্টা আর এক ভাগ ভাগ্য। কিন্তু ঐ এক ভাগের অভাবেই বাংলা পারল না। কথায় বলে, কপাল খারাপ হলে পোড়া-শোলমাছটা পর্যন্ত পালিয়ে জলে চলে যায়।

সত্যি দুর্ভাগ্য যেন এবার বাংলাকে তাড়া করেছে শুরু থেকেই। প্রথমেই অশুভ সংকেত। মতান্তর হল আই এফ এ ও কোচ অরুণ সিনহার মধ্যে। অরুণ সিনহার পদত্যাগের পর এলেন অচ্যুত ব্যানার্জি, যাঁকে আই এফ এ প্রথমে বাতিল করেছিল। জানি না এর আগে কখনও বাংলার কোনও কোচ পদত্যাগ করেছেন কিনা। তার চেয়েও বড় কথা, বোধহয় এর আগে কখনও বাংলার এতগুলি খেলোয়াড় একসঙ্গে আহত হননি। কে আঘাত পাননি? অধিনায়ক শ্যামল ব্যানার্জি, মানস, মিহির দেবাশিস। অমলরাজ, রমেন, প্রশান্ত, প্রেমনাথ ও কম্পটনের আঘাত ওঁদের মতো গুরুতর না হলেও দলের সমস্যা সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। আর বাবার অসুস্থতার জন্যে সাব্বির তো রৌরকেল্লাতে যেতেই পারেননি। কটক থেকেই হায়দ্রাবাদ

চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং বাংলা পূর্ণ শক্তিতে কোনও খেলাতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি।

পূর্ণ শক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারলেই বা কী হত? অভিজ্ঞ কোচ অচ্যুত ব্যানার্জি তো পাইকারি হারে খেলোয়াড় বদল করেছেন। যার জন্য দলের শক্তিটা সঠিকভাবে যাচাই হল না একদিনও। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোচিং ক্যাম্পে করা উচিত, অচ্যুতবাবু সেটা স্টেজেই করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছেন। এক-একদিন এক-এক রকম দল খেলার জন্যে, আবার অনভ্যস্ত জায়গায় খেলার জন্যেও, দলে প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা আসেনি। স্টপার সমরকে কেন দ্বিতীয় দফার সেমি-ফাইনালে লেফট ব্যাক খেলানো হল? প্রেমনাথ ফিলিপসকে নামানো যেত না? কেনই বা গোয়ার বিরুদ্ধে খেলায় কলকাতা থেকে পৌঁছনো মাত্রই বিদেশকে বিশ্বজিতের বদলে নামানো হয়েছিল? সর্বোপরি, বাংলার এবার টীম স্পিরিট ছিল না মোটেই। বাংলা যেন আগেই হেরে বসেছিল। যেন "খেলতে হয় তাই খেলছি"। এর জন্যে অবশ্য রোভার্স ও ডুরান্ড কাপে খেলার ক্লান্তি, অবসাদ ও আঘাতই দায়ী।

তবুও আবার বলছি, ভাগ্য সহায় থাকলে সব বাধা অতিক্রম করে বাংলার জয় হত।

আগামীবার হয়তো বাংলা সন্তোষ ট্রফি পুনরুদ্ধার করবে। হয়তো বা তার পরের বারও। কিন্তু পরপর ছ'বার জেতা? আনন্দ-মেলার পাঠক-পাঠিকারা তা কোনও দিন দেখতে পেলেও পেতে পারো। কিন্তু সে যে খুবই শক্ত ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে গোয়া, পাঞ্জাব, রেল ইত্যাদি দলের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য তো ক্রমেই কমে আসছে।

পাঞ্জাব-রেল। সুরিজিৎ সিং বল ধরতে লাফিয়েছেন

গোয়া-বাংলা। ভয়লেন্ট গোল করেছেন

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

যখন দেখছেন...

মাড়ি সুস্থ-সবল ও মজবুত রাখার জোরালো উপাদান ফ্ল্যাশে আরো জোরদার আছে... *

* গ্লিসারিন + সর্বিটল = মাড়িতে দাঁত আরো শক্ত-মজবুত ভাবে আটকে থাকার ফলাফল!

মেজেই দেখুন না...

... আর যাচাই করুন, আমরা বাড়িয়ে বলছি কি-না। প্রথমতঃ, ফ্ল্যাশে সুন্দর পিপারমেন্ট স্বাদের এমন এক চমৎকার নীল উপাদান আছে, যা দাঁতে কোনো পোকা হতে দেয় না—আর আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসও থাকে তাজা, নির্মল সৌরভে ভরা। দ্বিতীয়তঃ, এতে আবার যে ডিসিপি (ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট)উপাদান রয়েছে, সেটি আপনার দাঁতকে করে তুলবে ঝকমকে সাদা, যেন মুক্তো-ঝরা।

ব্যস, এবার ওয়াকিবহাল হলেন তো। সুতরাং, আর ভাবনা-চিন্তা না করে ফ্ল্যাশের মজার স্বাদ নিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন কেন একে বলা হয় অদ্বিতীয় টুথপেষ্ট। আর এই জন্যেই তো, ফ্ল্যাশ—চমৎকার পিপারমেন্টের তরতাজা মজাদার স্বাদ ও সরেস কোয়ালিটির গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে ভিয়েনায় ওয়ার্ল্ড সিলেকশন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সবাইকে হারিয়ে সোনার মেডেলটি জিতে এল।

ফ্ল্যাশ টুথব্রাশ
দর্শনীয় ডিজাইনের সুন্দর হাতল আর বিদেশী নাইলন ব্রিসল(গুছি)—ফলাফল, সঠিক পদ্ধতিতে অনায়াসে দাঁত ব্রাশ। ৬টি আকর্ষণীয় রঙে পাবেন।

ফ্ল্যাশ
টুথ পেস্ট

ফ্ল্যাশে দাঁত উজ্জ্বল—ঝলমলে, নির্মল!

ওয়ার্ল্ড সিলেকশন পুরস্কার বিজেতা।

everest/80/FL/659/bn

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে "অলমারিতে টাকা নেই। অন্য জায়গায় আছে।" অচেনা লোক কাকাতুয়া কিনতে চায়। সাধু এসে পাখির উপর হামলা করে। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক অহুত, তাঁর জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছে। শীতের রাত্তিরে উদ্ধবের ঘরে কেউ ফ্যান চালায়। সার্কাসে যে মুখোশ-পরা লোকটা রোমহর্ষক খেলা দেখায়, দারোগা কুন্দকুসুম জানতে চান, সে কে। জেল-পালানো গোবিন্দ ওস্তাদ নয় তো? তারপর....

॥ ৭ ॥

উদ্ধববাবু ওঠেন একেবারে কাক-ভোরে। তখনও আকাশে চাঁদ তারা থাকে। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ঠাকুর-পুজো সেরে বেড়াতে বেরোন। আর বেরিয়েই বেশ গলা ছেড়ে গান ধরেন।

আসল কথা হল, ছেলেবেলা থেকেই উদ্ধববাবুর খুব গাইয়ে হওয়ার শখ। শখটা খুব তীব্র, কিন্তু তাঁর গলায় সুর নেই। সুরটা এমন জিনিস যে, জন্ম থেকে যার আছে তার আছে। যার নেই, সে গলা সেধে মুখে রক্ত তুলে ফেললেও হবে না।

উদ্ধববাবুর গলা নেই। তবু সেই ছেলে-বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গলা সেধেছেন, গানের মাস্টারমশাই রেখেছেন, বড় বড় ওস্তাদের জলসায় গেছেন। তাঁর ধারণা ছিল সাধনায় সব হয়। কিন্তু গানের সাধনা করতে গিয়ে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি হচ্ছে দেখে বাবা খুব রাগারাগি করতেন। তারপর গান গাইতে বসলে পাড়া প্রতি-বেশীরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজাত, শাঁখে ফুঁ দিত। একবার নতুন এক বউদি তাঁকে বলেছিলেন, "উদ্ধবঠাকুরপো, চার আনা পয়সা দেব, আজ আর গান গেও না।"

এইসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধববাবু আর প্রকাশ্যে গান গান না। তবে তাঁর এখনো ধারণা, চেষ্টা করলে এবং লোকে বাগড়া না দিলে তাঁর গলা একদিন খুলে যেত ঠিকই।

যেত কেন, গেছেই। প্রকাশ্যে গান না গাইলেও রোজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে শহরের নির্জন প্রান্তে এসে উদ্ধববাবু নিয়মিত গলা সাধেন। দীর্ঘদিনের এই গোপন সাধনার ফলে তিনি ইদানীং লক্ষ করছেন, তাঁর গলায় সাতটা সুর চমৎকার খেলা করছে। হাঁ করলেই যেন গলা থেকে সাতটা পাখি বেঁরিয়ে চারদিকে উড়ে বেড়ায়।

উদ্ধববাবুর খুব ইচ্ছে, এবার একদিন একটা জলসা ডেকে সকলের সামনে গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু মুশকিল হল, ওস্তাদ রাঘব ঘোষকে নিয়ে। উদ্ধববাবু রাঘবকে দুচোখে দেখতে পারেন না। সারা তল্লাটের লোক রাঘবকে বড় ওস্তাদ বলে কেন যে অত খাতির করে, তাও তাঁর বোধের অগম্য।

সে যাই হোক, একদিন তিনি পুবের মাঠে এক শিশিরভেজা ভোরে খুব আবেগ দিয়ে ভৈরবী ধরেছিলেন। চোখ বুজে গাইছেন। হঠাৎ একটা ফোঁপানির শব্দে গান থামিয়ে চোখ মেলে দেখেন, সামনেই রাঘব। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে রাঘব বললেন, "এমন অনৈসর্গিক গান কখনো শুনিনি উকিলবাবু। তবে বলি এ গান সকলকে শোনানোর নয়। বিশেষ করে আপনার মক্কেলরা যদি শোনে, তবে তাদের ধারণা হবে, ইনি যখন এত ভাল গায়ক, তখন নিশ্চয়ই ভাল উকিল নন। কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে একজন মানুষ সাধারণত একটা বিষয়েই পারফেকশন লাভ করতে পারে।"

সেই থেকে উদ্ধববাবুর রাগ। ইচ্ছে করেই তিনি রোজ সকালে একবার রাঘব ঘোষের বাড়ির কাছাকাছি এসে খানিকক্ষণ গান করেন। অভদ্র লোকটা বুঝুক গান কাকে বলে। আজও উদ্ধববাবু পুবের মাঠে এসে রাঘবের বাড়ির দিকে মুখ করে চমৎকার তান লাগালেন ভৈরবীতে। গাইতে গাইতে তাঁর

নিজের পিঠ নিজেরই চাপড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, শাব্‌বাশ।

আশ্চর্য, এই চোখ বুজে গাইতে-গাইতেই হঠাৎ টের পেলেন, কে যেন সাঁতাই তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল, শাব্‌বাশ।

উদ্ধববাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন, গবা পাগলা।

গবাও বেকুবের মতো চেয়ে-চেয়ে খানিকক্ষণ তাঁকে দেখে বলে উঠল, "উদ্ধব-কর্তার যে আবার গান-বাজনাও আসে, তা তো জানতাম না।"

উদ্ধববাবু একটু রাগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী করছিস?"

গবা মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে কিছু করছিলাম না। কাল রাতে একটি লোক আমাকে এখানে খুন করে রেখে গেল। সেই থেকে মরে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ এই সকাল-বেলায় আপনার গানে প্রাণ ফিরে এল। ওঃ, কী গান। মড়া পর্যন্ত উঠে বসে।"

"কী যা-তা বলছিস। কে তোকে মেরে রেখে গেল?"

"আজ্ঞে, তাকে তো চিনি না। কালো পোশাক পরা, মুখ ঢাকা। রাতে গিয়ে আমার ঘরে হাজির। বলল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, অনেক টাকা দেব। রাজি না হলে প্রাণ যাবে।"

"বলিস কী?"

"আজ্ঞে, যা ঘটেছিল, বলছি। লোকটা বেশি ধানাই-পানাই না করে বলল, উদ্ধববাবু যে কাকাতুয়াটা কিনেছেন সেটা আসলে আমার। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। আমি পাখিটাকে কিনতে চাই, কিন্তু উদ্ধব-বাবু বেচতে তেমন গা করছেন না। আইন দেখাচ্ছেন। আমার বড় আদরের কাকাতুয়া। তা তুমি যদি পাখিটা উদ্ধার করে দিতে পারো, তবে দুশো টাকা পাবে। নইলে..."

"নইলে মেরে ফেলবে?"

"ওই 'নইলে' কথাটায় আমার খটকা লাগল। পাখিটা ফেরত চায়, ভাল কথা, কিন্তু মানুষ খুন করতে চায় কেন? অত গরজ কিসের? তা আমি সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই লোকটা অ্যাই বড় একটা ভোজালি বের করে আর এক হাতে আমার টুঁটি ধরে টানতে-টানতে মাঠের মধ্যে নিয়ে এল।"

"অ্যাটেমপট অব মার্ডার।" উদ্ধববাবুর ওকালতি-মাথা কাজ করছে। বিড়-বিড় করে বললেন, "অ্যাটেমপ্‌ট অব থেপট, থ্রেটেনিং অ্যাসাল্ট। তা লোকটা হঠাৎ ভোজালি বের করলই বা কেন? তুই তাকে কী বলেছিলি?"

"আজ্ঞে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যুধিষ্ঠিরবাবু, আপনার পাখিটার জন্য এত গরজ কিসের?"

"যুধিষ্ঠিরবাবু! সে আবার কে?"

"আপনি চেনেন তাঁকে। বাচ্চাদের বাড়িতে পড়ান যে নতুন মাস্টারমশাই, তিনি।"

"বলিস কী! লোকটা কি সত্যিই যুধিষ্ঠির?"

"আজ্ঞে না। সত্যিকারের যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্তুর। ইনি তিনি নন।"

"আরে দূর গাধা! আমি বলছি আমাদের যুধিষ্ঠির কিনা।"

"তাই বা বলি কী করে? তবে যুধিষ্ঠিরবাবু খুব পান আর জর্দা খান। আমিও রাত্রিবেলার যমদূতটার মুখ থেকে সেই জর্দার গন্ধ পেয়েছিলাম। তাই—"

"তারপর?"

"তারপর মাঠের মধ্যে এলে লোকটা ছোরা রেখে দু'হাতে আমার গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলল।"

"ফেলল? তবে বেঁচে রইলি কী করে?"

"কে বলল বেঁচে ছিলাম? সেই কখন থেকে মরে পড়ে আছি। সকালবেলা আপনার গান শুনে সেই মরা দেহও জেগে উঠল। তাই ভাবলাম এমন যার গান, তাকে একটা শাবাশ জানিয়ে আসি। তা এসে দেখি আপনি স্বয়ং।"

উদ্ধববাবু গানের কথায় একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, "গানের কথাটা অত বলার দরকার নেই।"

গবা অবাক হয়ে বলে, "বলেন কী? এমন উপকারী গান আমি জন্মে শুনিনি! আপনার গান শুনতে তেমন ভাল নয় বটে। মাথা ঘোরে, গা বমি-বমি করে, ভিতরটা কেমন চমকে-চমকে ওঠে। কিন্তু মরা শরীরে প্রাণও ফিরে আসে। পারবে রাঘব ঘোষ এমন গান গাইতে? রাঘবের তা-না-না কেবল লোক ভোলানোর জন্য। এখনো সা লাগাতে পারল না ঠিকমতো।"

এ-কথায় উদ্ধব খুশি হলেন। বললেন, "হুঁ।"

গবা বলল, "এ গান অবহেলার বস্তু নয় কবরখানার কাছে বসে গাইলে কবর ফুঁড়ে অনেক মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে আসবে। শ্মশানের কাছে বসে গাইলে অনেক মড়া

চিতা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়োদৌড়ি শুরু করবে।"

"আঃ! বাজে বকিস না তো! আমি ভাবছি কাকাতুয়াটার কথা। ওটাকে নিয়ে চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। খোঁজ নিয়ে বের কর তো, কাকাতুয়াটা আসলে কার! পাখিটা মাঝে-মাঝে টাকার কথা বলে। মনে হয় কোনো গুপ্ত টাকার খোঁজ জানে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলে না।"

আমারও তাই মনে হয়। দেখব'খন খোঁজ নিয়ে।"

শেষরাতে যখন গোটা সার্কাসের চত্বরটা ঘুমে অচেতন, তখন হঠাৎ নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি বাঘের খাঁচার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার চেহারা বিশাল দশাসই। কিন্তু হাঁটাচলা বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র এবং নিঃশব্দ।

ছায়ামূর্তি সবচেয়ে কাছের ছোট্ট একটা তাঁবুর দরজার পর্দা তুলে ঢুকে যায়। তার হাতে খোলা রিভলভার এবং টর্চ। টর্চটা জ্বেলে সে ঘুমন্ত লোক দুটোকে দেখে। এরা নয়।

আবার ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ গতিতে বেরিয়ে আসে ছায়ামূর্তি, আর একটা তাঁবুতে ঢোকে। এখানে চারজন লোক ঘুমিয়ে আছে। টর্চ জ্বেলে ছায়ামূর্তি তাদের ভাল করে দেখে নেয়। না, এরাও নয়।

ছায়ামূর্তি একের পর এক তাঁবুতে হানা দেয়। কিন্তু যে লোকটাকে দেখবে বলে আশা করছে তাকে কোথাও দেখতে পায় না।

শেষ তাঁবুটা একটু দূরে। খুব ছোট্ট। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। এমন-কী ফটকটায় তালা লাগানো।

ছায়ামূর্তি একটু দাঁড়ায়। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে টপ করে কাঁটা-

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

তারের বেড়া ডিঙিয়ে যায়।

রিভলভারটা বাঁগিয়ে ধরে লোকটা খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখে নেয়। তারপর খুব সাবধানে পর্দাটা ফাঁক করে টর্চ জ্বালে। অস্ফুটস্বরে বলে, "আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য!"

আশ্চর্য হওয়ারই কথা। তাঁবুটার মধ্যে কিছুই নেই। এমন-কী, অন্যান্য তাঁবুর মতো একটা খাটিয়াও না, মানুষ তো দূরের কথা।

ছায়ামূর্তি টর্চটা জেবলে চারদিকে ঘুরে-ঘুরে খুব ভাল করে দেখে। না, এই তাঁবুটা এখনো কেউ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এই ফাঁকা তাবুটার জন্য এত সতর্কতা কেন, তা ছায়ামূর্তি বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ ছায়ামূর্তি চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাইরে একটা ঢিল পড়ার শব্দ হল না? বেশ বড় এফটা ঢিল!

ছায়ামূর্তি খুব সতর্কতার সঙ্গে দরজার কাছে আসে এবং বাইরে উঁকি মারে। চারদিকে আজ বেশ কুয়াশা আছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষরাতের একটু জ্যোৎস্নায় চারদিক খুব আবছা দেখা যায়।

ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসার জন্য বাইরে পা দিতেই ঘটনাটা ঘটল।

পিছন থেকে হঠাৎ কে যেন বজ্রকঠোর হাতে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। তারপর হাঁটু দিয়ে কোমর ঠেসে ধরল। ছায়ামূর্তি নিজে প্রচন্ড শক্তিশালী লোক। গায়ের জোরে তার জুড়ি নেই। সুতরাং সে এক ঝটকায় হাতের বাঁধনটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। যে তাকে ধরেছে, সে শুধু তার চেয়ে বেশি শক্তিশালীই নয়, অনেক বেশি ক্ষিপ্রও। এক হাতে ছায়া-মূর্তির গলাটা ধরে রেখেই অন্য হাতে রিভলভার-ধরা হাতের ওপর একটা কারাটে চড় বসাল।

রিভলভারটা ছিটকে গেল হাত থেকে। ছায়ামূর্তি যন্ত্রণায় ওফ্ বলে আবার লোকটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু জোঁকের চেয়েও ছিনে লোকটার হাত আরো বজ্রবাঁধনে চেপে ধরল তাকে। ছায়ামূর্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

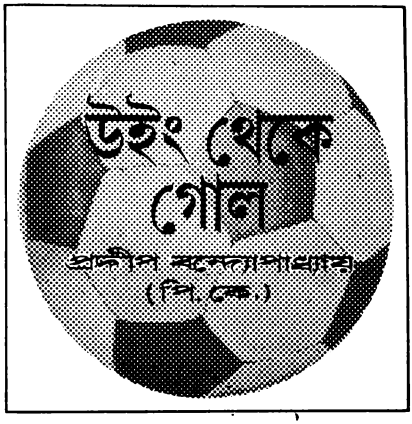

॥১৪॥

উনিশশো পঞ্চান্নর ডুরান্ডে রেল টীমের খেলা দিল্লির দর্শকদের মুগ্ধ করল। পর পর তিনটে ম্যাচ জেতার পর আমাদের খেলতে হল তখনকার দুর্ধর্ষ টীম হায়দরাবাদ পুলিসের সঙ্গে। লড়াই করে হারলাম। বাঁ পায়ের কোনাচে শটে একটা গোল করায় কিছু হাততালি পেয়েছিলাম। কিন্তু টীম হেরে গেলে, হাততালির শব্দ কারই বা ভাল লাগে, বলো!

দিল্লিতেই আমার খেলা দেখে ব্রিটিশ কোচ রন মিডস খুশি হয়েছিলেন। 'রাজকুমারী অমৃত কাউর কোচিং স্কীম'-এর সূত্রে রন মিডস ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় আমাদের ট্রেনিংয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল তাঁরই।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলের জন্য ট্রায়াল ক্যাম্পে বত্রিশজন ফুটবলারকে ডাকা হয়েছিল। দিল্লিতেই খবর পেলাম যে, আমার নাম রয়েছে। কিন্তু কলকাতার একাধিক দৈনিক পত্রিকায় বেরোল—এস বানারজি। পত্রিকার অফিসে যে লিস্ট এসেছিল তাতে শুধু 'ব্যানার্জি' লেখা ছিল। পত্রিকার লোকেরা 'ব্যানার্জি' বলতে এস (বদ্রু) ব্যানার্জি বুঝেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

ট্রায়াল ক্যাম্পে বিখ্যাত রাইট উইঙ্গার কানাইয়ান ছিলেন। সার্ভিসেসের রাইট উইঙ্গার মুখার্জিও ছিলেন। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এবারও কি বাদ পড়ব নাকি? বাঘাদা কিন্তু সব সময় বলতেন, "তোকে কেউ বাদ দিতে পারবে না।"

রন মিডসের ট্রেনিংয়ে সকলেরই বেশ কিছুটা উন্নতি হল। দারুণ ভালমানুষ এই মিডস এখন ফিফার সিনিয়র কোচ। ট্রায়াল ক্যাম্পেই একদিন তিনি বললেন, "ভাল ফরোয়ার্ডের শটের নিশানা অব্যর্থ হওয়া চাই। পেনাল্টি স্পট থেকে দশবারের মধ্যে সাত-আটবার ঠিক ক্রস-পীসে মারতে পারলে বুঝব নিশানা ঠিক আছে।" মিডস সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই পূরণ বাহাদুরের মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে গেল—"ননসেন্স"!

মিলিটারি অফিসার পূরণ বাহাদুর আগের বছর (১৯৫৪) কলকাতায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে দারুণ খেলেছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও তাঁর ঝুলিতে ছিল। পূরণ বিশ্বাস করতে পারেননি যে পেনাল্টি স্পট থেকে দশবারের মধ্যে সাত-আটবার কেউ ক্রস-পীসে বল মারতে পারে। 'ননসেন্স'—এই শব্দটা রন মিডসের চোখে যেন আগুন লাগিয়ে দিল। তারপর, অস্বাভাবিক ঠান্ডা গলায় বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস ফুটবল ছেড়েছি অনেক আগে। তবু, এসো, ব্যাপারটা তোমাদের দেখাই।" প্র্যাকটিসের জন্য সাতটা বল ছিল। একটার পর একটা শট নিলেন। সাতবারই বল বাঁ-দিকের ক্রস-পীসে লাগল। পূরণ ক্ষমা চাইলেন। আপাদমস্তক ভদ্রলোক মিডস সাহেব হেসে বললেন, "নেভার মাইন্ড।"

ট্রায়াল ক্যাম্পের শেষের দিকেই বোঝা গেল, মিডসকে কোচ হিসাবে টীমের সঙ্গে ঢাকায় পাঠানো হবে না। তবু তিনি কলকাতায় থেকে আমাদের শেষ পর্যন্ত উৎসাহ দিয়ে গেলেন।

স্পষ্ট মনে আছে, শেষ ট্রায়াল ছিল বিজয়া দশমীর দিন। আমরা সকলেই ব্রডওয়ে হোটেলে ছিলাম। পুজোর সময়েও ছুটি দেওয়া হয়নি, পাছে কেউ বাড়ি চলে যায়। ঐ উনিশ বছর বয়সে পুজোর দিনগুলো হোটেলের ঘরে বন্দী থাকতে বড় কষ্ট হত। একটা ভ্যান আমাদের নিয়ে যেত, সেই ভ্যানেই হোটেলে ফিরতাম। বাড়ির জন্যও মন খারাপ করত। কিন্তু বাবা চিঠি দিলেন:

'পুজো অনেক এসেছে, অনেক আসবে। কিন্তু ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ চিরকাল পাবে না। ভাল করে খেলো, যাতে টীমে থাকতে পারো।'

আগের ট্রায়াল ম্যাচগুলোতেও ভাল খেলেছি, গোলও পেয়েছি। একদিন রাইট ব্যাক আজিজ আমার দিকে খেললেন। তাঁকে কাটিয়ে গোল করলাম। খেলার পর জড়িয়ে ধরে আজিজ বললেন, "এই তো চাই!"

শেষ ট্রায়াল ম্যাচে কিন্তু রাইট উইঙ্গার হিসেবে খেলার সুযোগ পেলাম না। এক-দিকের রাইট উইঙ্গার কানাইয়ান, অন্য দিকে সার্ভিসেসের মুখার্জি। লেফট ইনসাইড খেলতে হবে শুনে কিছুটা দমে গেলাম। বাঘাদা অভয় দিলেন, "এত ঘাবড়ানোর কী আছে? ঠিক করে খেল, তোকে বাদ দিতে পারবে না।"

খেলা শুরু হল। অনভ্যস্ত পজিশনে খেলেও দুটো গোল করে ফেললাম। আমাদের টীম জিতল ঐ দু গোলেই। খেলার পর বাঘাদাকে খুব খুশি মনে হল। এরিয়ানের বলাই মিত্রও খুব খুশি হলেন। যা খেলেছি, তাতে টীমে থাকা উচিত। তিপ্পান্নর পর থেকে ভারতীয় টীমে ঢোকার দরজায় কড়া নাড়ছি, এবার হয়তো আমি বাদ পড়ব না। তবু ভয় যেন কাটতে চায় না। দুরুদুরু বুকে হোটেলে ফিরলাম, কারণ সেই রাত্রেই টীম ঘোষণা করা হবে। হোটেলে ফেরার সময় দেখলাম, বিসর্জনের মিছিল চলেছে। ভাসান ...ছেলেবেলার কত কথাই যে মনে পড়ল। বিসর্জনের বাজনা শুনতে-শুনতে ছেলেবেলার কথা, জলপাইগুড়ি আর জামশেদপুরের কথা মনে এল। এই দিন রাত্রে তো বাবা-মাকে প্রণাম করার কথা। কিন্তু আমি ওঁদের থেকে কত দূরে!

হঠাৎ নিখিল নন্দীর ডাকে ঘোর কেটে গেল—"নাম্ প্রদীপ, হোটেল এসে গেছে!"

সাতটা থেকে ন'টা—এই দু' ঘন্টা এক অসহ্য প্রতীক্ষায় আমরা থাকলাম। অধিনায়ক আজিজ টীমের অপরিহার্য খেলোয়াড়। আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, "তোমার এত চিন্তার কী আছে? তুমি তো চান্স পাবেই। যাও, জলখাবার খেয়ে বিশ্রাম নাও।"

তবু চিন্তা যায় না। নিখিল নন্দী আর আমি বসে-বসে ভাবি, 'আমাদের নাম থাকবে তো!' শেষ পর্যন্ত লিস্ট নিয়ে হোটেলে এলেন এম দত্তরায়। সবাইকে হলঘরে জড়ো করে টীম ঘোষণা করলেন। আজিজ (ক্যাপ্টেন), লতিফ, সনৎ শেঠ, থঙ্গরাজ কেম্পিয়া, নিখিল নন্দী, পদ্ম মিত্র, সাত্তার, মেওয়ালাল, পি কে...। পরের নামগুলো শোনার মতো অবস্থা আর ছিল না। প্রচন্ড আনন্দে নাচব কিনা ভাবছি, হঠাৎ চোখ পড়ল পাশে-দাঁড়ানো উইংহাফ মহম্মদ আলির দিকে। উনিশশো চুয়ান্নয় ইন্টার রেল টুর্নামেন্টে ইস্টার্ন রেল টীমের হয়ে আমরা একসঙ্গে খেলেছিলাম। সেই মহম্মদ আলি বাদ গেলেন। নিজের আনন্দ ভুলে গিয়ে মহম্মদ আলির পিঠে হাত রাখলাম। মহম্মদ আলি হাসলেন। অদ্ভুত বিষণ্ণ সেই হাসি।

আমি ছাড়াও প্রথম ভারতীয় দলে এলেন কেম্পিয়া। কেম্পিয়ার ঘরে গিয়ে অভিনন্দন জানালাম। নিখিল নন্দী আর থঙ্গরাজও এলেন। হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব শুরু হল। হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন মহম্মদ আলি। আমরা স্বভাবত গম্ভীর হয়ে গেলাম। যারা বাদ পড়েছে, তাদের কথা ভেবে অন্তত আজ রাত্রে আমাদের হৈ চৈ করা উচিত নয়, সেটা উপলব্ধি করলাম। কিন্তু মহম্মদ আলি কী করলেন, জানো? কেম্পিয়ার খাটের মাঝখানে বসে মিষ্টি হেসে বললেন, "ফ্রেন্ডস, আমি না হয় টীম থেকেই বাদ পড়েছি। তাই বলে কি আড্ডা থেকেও বাদ যাব? তোমরা টীমে আছ, সেটাও তো আমার কাছে আনন্দের ব্যাপার। তাছাড়া, আমার চেয়ে ভাল প্লেয়াররাই চান্স পেয়েছে। তাতে দুঃখের কী আছে? আড্ডা যেমন চলছিল, চলুক। তোমরা কেউ না-হাসলে, আমি একা হাসব, সেটা কি ভাল হবে?"

সদ্য-বাদ-পড়া মহম্মদ আলির কথা শুনে আমরা সকলেই হেসে ফেললাম। সেই রাতের আড্ডার শেষ কথাও মহম্মদ আলিই বললেন —"ফ্রেন্ডস, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। তোমাদের ঢাকায় ভাল খেলতে হবে। কাল থেকেই আরো জোরদার প্র্যাকটিস করতে হবে। আর আমার তো ছুটি...কী মজা!"

(ক্রমশ)

বাসুর আপনজনেরা

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

ব্রেকফাস্ট টেবিলে আচমকা বিপত্তি। হাঁচির ধাক্কায় বাসুর নাক, মুখ, চোখ সব কন্ট্রোলের বাইরে। সেই গত বছর পুরীর সমুদ্রে ঢেউ দেখেছিল যেমন। একটার পর একটা। আসছে তো আসছেই। আর নড়া ধরে ঝাঁকুনি আর ঝাঁকুনি।

"হোয়াট এ ফানি বয়," এই মন্তব্যটি বাসুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন যিনি, তাঁকে বাসুর মা বলে ডাকার কথা।

হ্যাঁচ্ছো—একটা লম্বা টানে হাঁচিটাকে ছড়িয়ে দিল বাসু।

"কী কেয়ারলেস ছেলে বাবা।"

ব্যস, মেশিনগানের ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল, বাসু ভাবল, আর এক দফা হাঁচির ধাক্কায় বেসামাল হতে হতে।

"দেখলে, দেখলে, সমস্ত টেবল ক্লথে... মাথায় একেবারে ড্রায়েড—"

"কাউডাং—হ্যাঁচ্ছো" পাদপূরণ করল বাসু।

"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"মোটেই না—হ্যাঁচ্ছো।"

ধারালো মুখ। চশমার এক-একখানা কাঁচ একশো গ্রাম ওজন। কনুই আর চিবুক যেন শানানো সঙ্গিন। সব সময় পাটভাঙা শাড়ি-পরা, মুখে হালকা পাউডার, এই মহিলাকে মা বলে ডাকতে শেখানো হয়েছে বাসুকে।

মা ছিলেন আর একজন। ফর্সা। একটু মোটাসোটা। কপালে আধুলি সাইজের সিঁদুরের টিপ। তাঁকেই বাসু প্রথমে মা বলে ডাকত। সে আর ক-দিন। তিনি আর নেই অনেক কাল। পাঁচ বছর বয়েসের পর বাসু আর তাঁকে দেখেনি।

এখনকার যিনি মা তাঁর সঙ্গে বাসুর চেনাশোনা বছর-দুই। আগে শহরের বড় গার্লস স্কুলে অঙ্ক কষাতেন। বাসুর বাবার পদবী নেওয়া ইস্তক আর স্কুলের রাস্তা মাড়ান না। এখন তাঁর একমাত্র ছাত্র ক্লাস এইটে পড়া বাসু। এরিথমেটিক যার কাছে মানুষখেকো বাঘ, অ্যালজেবরা গুলি-খাওয়া সিংহ আর জিওমেট্রি গুণ্ডা হাতি। অঙ্ক ভুল

হলেই চাবুকের মতো কেটে বসে কথাগুলো. "হোয়াট এ ফানি বয়। মাথার মধ্যে স্রেফ ল্যায়েড কাউডাং।"

বাসুর বাবার কাছে এই মোজেইক, মার্বল, বাহারি গ্রিল দিয়ে মোড়া বাগানঘেরা বাড়িটার দরকার দুটো কাজে। ঘুমনো, আর চেম্বারে সকাল-সন্ধে মক্কেলদের সঙ্গে বসে কথা বলা। আর বাড়ির বাইরে বাবাকে টানে কোর্ট। মাঝে মাঝে বাসুকে জিজ্ঞাসা করেন, "কী রে পড়ছিস-টড়ছিস তো।" আর ফি-বছর জন্ম-দিনের আগে জানতে চান. "কী নিবি বল তো এবার।"

আগের জন্মদিনে নিয়েছিল গীয়ারওয়ালা সাইকেল। পাঁচশো টাকা দাম শুনে যাকে মা বলে ডাকার কথা তিনি ভুরু কুঁচকেছিলেন, বলেছিলেন, "এইভাবেই ছেলেরা স্পয়েলড হয়।" কিন্তু তাঁর ভুরুর ভাঁজের চেয়ে বাবার হাসির মাপ অনেক বড়। তাই জন্মদিনের আনন্দ টোল খায়নি বাসুর। এবার বাসুর ইচ্ছে একটা মোপেড নেয়।

সর্দিটা বেশ ভালো ভাবেই পেয়ে বসেছে বাসুকে। গরম কাল। তাই অস্বস্তিটা অনেক বেশি। বৃষ্টি কালবোশেখি এসব এবার মোটেই নেই।

নাক আর গলার মধ্যে আরও বেশি জ্বালা-জ্বালা করছে,তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথার মধ্যে দপদপানি। সাইকেলটা মেরামতির দোকানে। হেঁটেই চলল বাসু বন্ধু টুনুর বাড়ি। কাল দাবা খেলায় টুনুর কাছে হেরে গিয়ে অবধি মনে আর শান্তি নেই। শেষকালে বাসুর রাজা কিনা গজচক্রের পাকে পড়ল। রাগে সারা গা রি-রি। তার ওপর টুনুর কী বিচ্ছিরি জ্বালা ধরানো হাসি। কত বড় খেলোয়াড়। যেন বর্বি ফিশার এসেছেন। আজ শোধ নিতেই হবে।

টুনুদের বাড়িটা শহরের পুরনো পাড়ায়। যেখানে গাছপালা আর কাঁচা নর্দমা বেশি। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছে বাসু। সাইকেল-রিকশা, গাড়ি, ট্রাক কিছুর আওয়াজই কানে যাচ্ছে না। বাবার কাছে শুনেছে তার প্রপিতামহ রামনারায়ণ তর্কবাগীশ নাকি দুর্দান্ত দাবা খেলোয়াড় ছিলেন। একটা থলের মধ্যে দাবার ছক ভরে নিয়ে খেলার পার্টনার খুঁজে বেড়াতেন। সেই বিখ্যাত দাবাড়ুর বংশধর হয়ে বাসুর এই লাঞ্ছনা।

টুনুদের বাড়ি টুনু ছিল। কিন্তু ছিল না দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি। সেগুলো ওর বাবার জিম্মায়। টুনুর বাবা কাল রাত্তিরে ইংরেজি গ্রামারের বই তলব করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে টুনুকেও। টুনু,তার বাবা আর ইংরেজি গ্রামারের যোগাযোগটা খুব ভাল হয়নি। ফলে টুনু অল্পবিস্তর আহত। দাবার বোর্ড, ঘুঁটি সব বাজেয়াপ্ত। অগত্যা টুনু বাসু দুজনেই বোসেদের বাগানে।

বাসু জিজ্ঞেস করল, "আর কারও বাড়িতে নেই দাবার বোর্ড?" টনু স্রেফ ঠোঁট উল্টোল।

"কী দাদুভাই, হবে নাকি এক হাত।"

প্রশ্নটা দুজনকেই বিস্মিত করল চেয়ে দেখে এক বুড়ো। লম্বা লম্বা চুল দাড়ি। কাঁধে মস্ত একটা ঝোলা।

ওরা দুজনে হাঁ করে তাকিয়ে তখনও। বুড়ো ততক্ষণে দাবার ছক বের করে ফেলেছে। কিম্ভূত দেখতে একটা কাঠের পিঁড়ি। তার ওপর সাদা-কালো ছক আঁকা। ঘুঁটিগুলোও অন্যরকম। কাঠের তৈরি। লাল আর কালো রঙ করা। কেমন মন্দির-মন্দির চেহারা।

"এ আবার কী রকম ঘুঁটি?" বাসু জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো হাসল, বলল, "একই ব্যাপার দাদু-ভাই। একটু চিনে নাও। সেই একই রকম চাল।"

বাসুর মনে হল এই রকম একজন দাবা-পাগল বুড়োর কথা কোথায় শুনেছিল। দু কানের ওপর শিরাগুলো দপদপ করছে। মাথার মধ্যে ঘুরনচাকি।

"আপনি কি করে জানলেন আমরা দাবার বোর্ড খুঁজছিলাম," টুনু আচমকা জিজ্ঞেস করল।

"আমার দাদুভাই যে কাল খেলায় হেরে গিয়ে আমাকে ডাকল। তাই তো চলে এলাম। দাদুভাইয়ের মন ভাল করতে।' টুনুর মনে হল বুড়োর হাসিতে রোদ্দুর ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো পট-পট করে টুনুর মনে অনেক-গুলো প্রশ্নের সুইচ অন করে দিল। কিছু বলার আগেই বাসুর পর পর কটি চালে ওর মুখ বন্ধ।

"এই, এই কী হচ্ছে," টুনু হাঁ-হাঁ করে উঠল, "হুড়মুড় করে এসে পড়লি যে। রাজাকে ডিফেনস নিতে দে।"

"ধুত্তোর রাজার ডিফেন্স, সামলা এবার ঘোড়ার কিস্তি," ঠক করে একটা বোড়েকে খেয়ে ঘোড়াটা বসাল বাসু।

"ঠিক আছে দাদুভাই, রাজাকে ঘর বাঁধতে দিও না, কিস্তিতে কিস্তিতে তছনছ করে দাও বন্ধুর রাজাকে," উবু হয়ে ছকের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে বুড়ো।

বুড়োটা বার বার বাসুকে দাদুভাই বলছে কেন? প্রশ্নটা মাথা তোলার আগেই নেতিয়ে পড়ল। বুড়ো সমানে বাসুর মনের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে।

"ও কী দাদুভাই, নৌকো সরিও না। নৌকো খেলবে শেষের দিকে ফাঁকা মাঠে, অনেক বল মারা যাবার পর। এখন ' ঘোড়া, পিল আর মন্ত্রী দিয়ে খেল।"

বুড়োর মুখ না নড়লেও বাসু পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল কথাগুলো। খানিক পরে বোড়ের চালে যা-তা ভাবে মাত হল টুনু। তার পরের খেলাটাতেও দশ মিনিটের মধ্যে টুনু নাজেহাল।

বেলা দেড়টা কখন পার। বাসুর এখনকার মা একদম খিদে সইতে পারেন না। বারোটা বাজতে না বাজতেই খেয়ে নেন। বাসুর খাবার দেয় বাড়ির ঠাকুর। এখনকার মা তখন ঘুমোন।

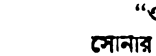

আজ অবশ্য বোজা চোখ বার বার খুলে যেতে লাগল তাঁর। মনের মধ্যে একটা মতলব। ক'দিন পরে কলকাতায় মাসতুতো দিদির মেয়ের বিয়ে। আত্মীয় মহলে স্বামীর পয়সা-ওলা লোক হিসেবে বেশ নামডাক। সেই নাম-ডাকের ইজ্জত রাখতে হলে বোনঝিকে সোনার একটা কিছু দিতেই হয়। কিন্তু হাজার টাকা ভরির সোনা দিয়ে গয়না গড়াবার কথা ভাবলেই গায়ে ছাঁকা। একটা রঙচটা লোহার হাতবাকসে কিছু ভাঙাসোনার টুকরো, চিঠি, ফোটো আর নানান টুকিটাকি আছে। বাক্সটা হাত বদলে এখন তার মালিকানায়। বাক্সটাতে আর আছে একজোড়া সোনার বালা। খুব বাচ্চার হাতের। কিন্তু ভরি দুই স্বচ্ছন্দে হবে। বালা দুটো সম্ভবত বাসুর ছেলেবেলার সম্পত্তি। এখনকার মার খুব ইচ্ছে এই বালাজোড়া ভাঙিয়ে বোন-ঝিকে একজোড়া চুড় বানিয়ে দেন। কর্তা জানতেও পারবেন না।

চাবি ঘুরিয়ে বাক্স খুলতে প্রথমে নজরে এল একখানা ছবি। অল্প বয়েসের বাসুর বাবা দাঁড়িয়ে। পাশে চেয়ারে বসে গোলগাল এক মহিলা। কোলে বাসু। তখন বয়েস বছর দুই। মুখ বেঁকিয়ে ছবিটা বাক্সের মধ্যে ফেলে দিলেন বাসুর এখনকার মা। হাত বাক্সটার মধ্যে নানান খোপ। একটায় সিঁদুর-মাখা ক'টা রুপোর টাকা। আর একটা খোপ খুলতেই সেই বালাজোড়া। তার সঙ্গে ভাঙা দুলের টুকরো, এক চিলতে সোনার চেন, এমনি কুচিকাচা সোনা। বালাজোড়া তুলে নিলেন এখনকার মা। মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি। ছমছমানি। দেওয়ালে বাসুর ঠাকুমার ছবি ছাড়া কোনো সাক্ষী নেই। শ্রীমতী শৈলবালা দেব্যা। সামনে শিবলিঙ্গ, কোষাকুষি নিয়ে পুজোয় বসেছেন। এখনকার মায়ের ছবিটার দিকে পিঠ। বালা দুটো আঁচলের মধ্যে।

"যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দাও।"

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও এতখানি চমকাতেন না এখনকার মা। ঘাড় ফিরোতেই শ্রীমতী শৈলবালা দেব্যার সঙ্গে চোখাচোখি। ছবির মানুষ জলজ্যান্ত ঘরের মধ্যে। ডান হাতের তর্জনীটি দোষী সনাক্ত করার ভঙ্গিতে।

"ওই বালা জোড়া দিয়ে আমি খোকন-সোনার মুখ দেখেছিলাম। তখন ওর এক বছর বয়েস। রেখে দাও বলছি।"

এখনকার মা জমাটবাঁধা প্যারিস প্লাস্টার। চোখ ঠিকই দেখছিল। কানও সব শুনতে পাচ্ছিল। কেবল হাত-পায়ে কোন সাড় নেই। অথচ দিন-দুপুর।

শব্দের ঝড় তুলে ট্রেন চলে গেল কাছের রেললাইন বরাবর। টুনু বলল, "একটা বেয়াল্লিশের প্যাসেনজারটা চলে গেল। অনেক দেরি হয়ে গেল তোর।"

"চাল দে," বাসু কেমন অন্যমনস্ক।

"কি আজে-বাজে বকছিস। সামনে বোর্ড কোথায় যে চাল দেব। সব খেলা জিতে একে-বারে নেশা ধরে গেছে নাকি তোর!" টুনু হেরে গিয়েও ঠুকতে চাইল বাসুকে। বলল,

"বুড়োটা তো দাবার ছক গুটিয়ে হঠাৎ হাওয়া। বলে গেল দাদুভাইকে শিগগির বাড়ি পাঠিয়ে দাও। ওর শরীর খারাপ।"

একটু থেমে এক রাশ প্রশ্ন সাজিয়ে দিল টুনু, "তোকে বুড়োটা সমানে দাদুভাই-দাদুভাই করছিল কেন রে? কে বুড়োটা? চিনিস নাকি?"

বাসুর মাথার মধ্যে নানান গোলমাল, গলা শুকিয়ে কাঠ। দু' কানের ওপরের শিরাদুটো এবারে ফেটে যাবে। সারা শরীরে উনুনের আঁচ। তবু বলল এক রকম করে, "হ্যাঁ চিনি। ওর নাম রামনারায়ণ তর্কবাগীশ। আমার প্রপিতামহ।"

"প্রপিতামহ বটে!" রসিকতা মনে করে হেসে উঠল টুনু। বলল, "ওঠ, বাড়ি যা। অনেক বেলা হয়েছে।" বাসুর গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল টুনু। "এ কী রে," টুনুর গলায় ভয় আর বিস্ময়, "তোর যে ভীষণ জ্বর হয়েছে। গা পুড়ে যাচ্ছে একেবারে। সাইকেল রিক্সা করে বাড়ি চলে যা এক্ষুনি।"

বাসুর এখনকার মা বেশ কিছু সময় ধরে থ। পাশে খোলা হাতবাক্স। আঁচলে বাঁধা বালা জোড়া। একটু পরে আবার হাতে পায়ে সাড়। চিমটি কেটে দেখলেন বেশ লাগে।

শ্রীমতী শৈলবালা দেব্যা আবার ছবির মানুষ। ঘরের বাইরে ঝনঝনে রোদ। কোথায় একটা ফটিক-জল পাখি ডেকে সারা। সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে পৃথিবীতে। বুকের মধ্যে এখনও একটু ধড়ফড়ানি।

উঠতে যাচ্ছিলেন মেঝে থেকে। আবার বসে পড়লেন। দরজার ফ্রেমে বাঁধান আর একটি ছবি। একটু আগে দেখা হাতবাক্সের মধ্যে বন্ধ ফটোগ্রাফের দুটি চরিত্র। মা আর ছেলে। বাসুর চোখ-মুখ লাল। তাকে জড়িয়ে গোল-গাল মোটাসোটা আর একটি মহিলা। ফর্সা রঙ। কপালে আধুলি সাইজের সিঁদুরের টিপ। শাঁখা আর লোহাপরা নিটোল হাত বাসুকে আঁকড়ে ধরে।

"ছেলেটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, শিগগির বিছানা করে শুইয়ে দাও।" বেশ হুকুমের সুরে বললেন সেই ফটোগ্রাফের মহিলা।

যাকে বলা তিনি চেয়েই আছেন, চেয়েই আছেন। পলক আর পড়ছে না। মুখ অল্প হাঁ-করা। বাসুর কিছুই খেয়াল নেই। মাথার মধ্যে ঘুরনচাকির পাক।

"কী গো, হাঁ করে বসে রইলে কেন? ধরো ছেলেটাকে।" একটু থেমে আবার, "এতখানি বেলা হয়ে গেল, বাছা খায়নি এখনও। আর নিজে কী বলে গিলে বসে রইল।"

বাসু চোখ খুলল। অনেক কষ্টে। এখনকার মায়ের মুখের চামড়া যেন ফরসা হয়ে যাচ্ছে।

আরও দুখানা মুখ তার ওপর আকুল হয়ে ঝুঁকে। একজনের চোখ ভারি ওজনের চশমা। "বাবা বাসু," আরও কাছে মুখ এনে বললেন এখনকার মা। চোখ দুটো আপনি বুজে গেল বাসুর। যা শুনল তার মানে বোঝার চেষ্টা করল। এখন-কার মায়ের মুখে এরকম আদরের ডাক কখনও শোনেনি। বাসু তাঁর কাছে শুধু ফানি বয় মাথায় ড্রায়েড কাউডাং।

"কী রে, কেমন বোধ করছিস?" এবার গলাটা বাবার। বাসুর মুখে আবছা হাসি। সেই হাসিটা বজায় রেখেই বলল, "বাবা-মা, আমাকে এবছর জন্মদিনে একটা মোপেড কিনে দেবে?"

ছবি মাখন দত্তগুপ্ত

যতদূর জানা যায়, পৃথিবীর সর্ব-প্রথম যন্ত্রচালিত ঘড়ি তৈরি হয় চীনদেশে। চীনসম্রাটের প্রাসাদে গৃহশিক্ষকের কাজ করতেন সু-সুং। তিনিই এই ঘড়িটির নকশা এবং বিবরণ রেখে গেছেন। ঘড়িটি ছিল ৩০ ফুট উঁচু এবং চলত জল-শক্তির সাহায্যে। প্রথম অ্যালার্ম ঘড়ি যেটির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ওয়ারজবার্ন শহরে ছিল। আর প্রথম পেণ্ডুলাম ঘড়ি? ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ শহরে খ্রীস্টীয়ান হাইগেনস নামে একজন বিজ্ঞানী সেটি তৈরি করেন। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই ঘড়িটি তৈরি হয়, সেটি আবি-ষ্কার করেছিলেন গ্যালিলিও, আরও ৭০ বছর আগে।

আবহাওয়াবিদ্

হিমাদ্রি লাহিড়ী

এককালে বিদেশে, বিশেষ করে ইউরোপে বা আমেরিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা ছিল। যে-কোনো ভারতীয় সম্পর্কেই তারা ভাবত সে বুঝি একজন মহারাজা, কিংবা ফকির, অন্ততপক্ষে জাদু-বিদ্যা তার নিশ্চয় জানা আছে। বছর কয়েক আগেকার কথা বলছি, একজন দাড়িওয়ালা ভারতীয় গিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের এক গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে। কাছেই একটা শহর, সেখানে তাঁর ছেলে ডাক্তারি করে। ভদ্রলোকের সময় কাটতে চায় না, তিনি আশেপাশের মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ান। পাখি, প্রজাপতি দেখেন। মাঝে মাঝে নদীর ধারে চুপচাপ বসে থাকেন। বিকেল হলে বাড়ি ফিরে আসেন।

এই রকম চলছিল বেশ, কিন্তু হঠাৎ ঐ অঞ্চলে সিনেমার ছবি তুলবার জন্য এক দল এসে উপস্থিত হলেন লণ্ডন থেকে। প্রথম দিন যখন তাঁরা ছবি তুলতে যাবেন তখন এল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। সারাদিন ওই রকম চলল, সেদিনকার মতো ছবি তোলা মাটি হয়ে গেল। বিকেলে বৃষ্টি থামলে চিত্রপরিচালক দেখলেন ঐ ভারতীয় ভদ্রলোক আস্তে আস্তে চলছেন। তাঁর মনে হল লোকটা যখন ভারতীয় তখন নিশ্চয়ই এর নানা রকম জাদুবিদ্যে-টিদ্যে জানা আছে। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন, ‘‘মশাই শুনুন, এই যে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে আমাদের দিনটাই মাটি হয়ে গেল, এটা যদি জানতাম তাহলে আজকের দিনটা বাদ দিয়ে আসতাম। আচ্ছা, বলতে পারেন আগামীকাল বৃষ্টি হবে কিনা?’’

ভারতীয় ভদ্রলোকটি বললেন, ‘‘না, কাল বৃষ্টি হবে না—কালকে ঝকঝকে রোদ্দুর উঠবে।’’

পরদিন দেখা গেল চমৎকার রোদ্দুর। ভদ্রলোক তো ঠিকই বলেছিলেন! পরিচালক মশাই পরদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে ছবি তুলবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে আরও সাতদিন ছবি তুলতে হবে। মোটামুটি ঐ অঞ্চলের গ্রামই হল ছবির পটভূমিকা। পরিচালক মশাই খুঁজেপেতে ভদ্রলোককে বার করলেন। এবারে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আগামী কাল কি বৃষ্টি হবে?’’

ভদ্রলোক বললেন, ‘‘হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে, ঝড় হবে, সঙ্গে শিলাও পড়তে পারে। খুবই দুর্যোগ চলবে দুদিন। তার পরদিন আকাশ সকালে মেঘলা থাকবে।’’

পরিচালক ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে সদলবলে লণ্ডন চলে গেলেন। এবং কী আশ্চর্য! দুদিন খুব বৃষ্টি-ঝড় হল, শিলাও পড়ল। তৃতীয় দিন তাঁরা এলেন এবং বিকেলের কয়েক ঘণ্টা কাজ করতে পারলেন।

এরকম দিন কয়েক চলল। ভারতীয় ভদ্রলোক আবহাওয়া সম্পর্কে যা বলেন প্রায় হুবহু মিলে যায়। পরিচালক ভাবলেন এই ভদ্রলোকটি তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, তাই তাঁকে কিছু পুরস্কার দেওয়া তাঁর কর্তব্য। এই ভেবে তিনি তাঁকে একশো পাউণ্ডের একটি চেক দিয়ে বললেন, ‘‘আর একদিন ছবি তোলা বাকি, তাহলেই কাজ শেষ। আগামী কাল কি আবহাওয়া ভাল থাকবে?’’

ভদ্রলোক বললেন, “বলতে পারি না।”

পরিচালক বললেন, ‘‘আপনি কি ধ্যান করতে পারেননি, আপনার মন কি কোনো কারণে বিক্ষিপ্ত ছিল? আপনার কি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে?’’

ভদ্রলোক বললেন, ‘‘ওসব কিছু না, আজ রেডিয়োয় আবহাওয়া-সংবাদ শুনতে ভুলে গেছি।’’

ছবি দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

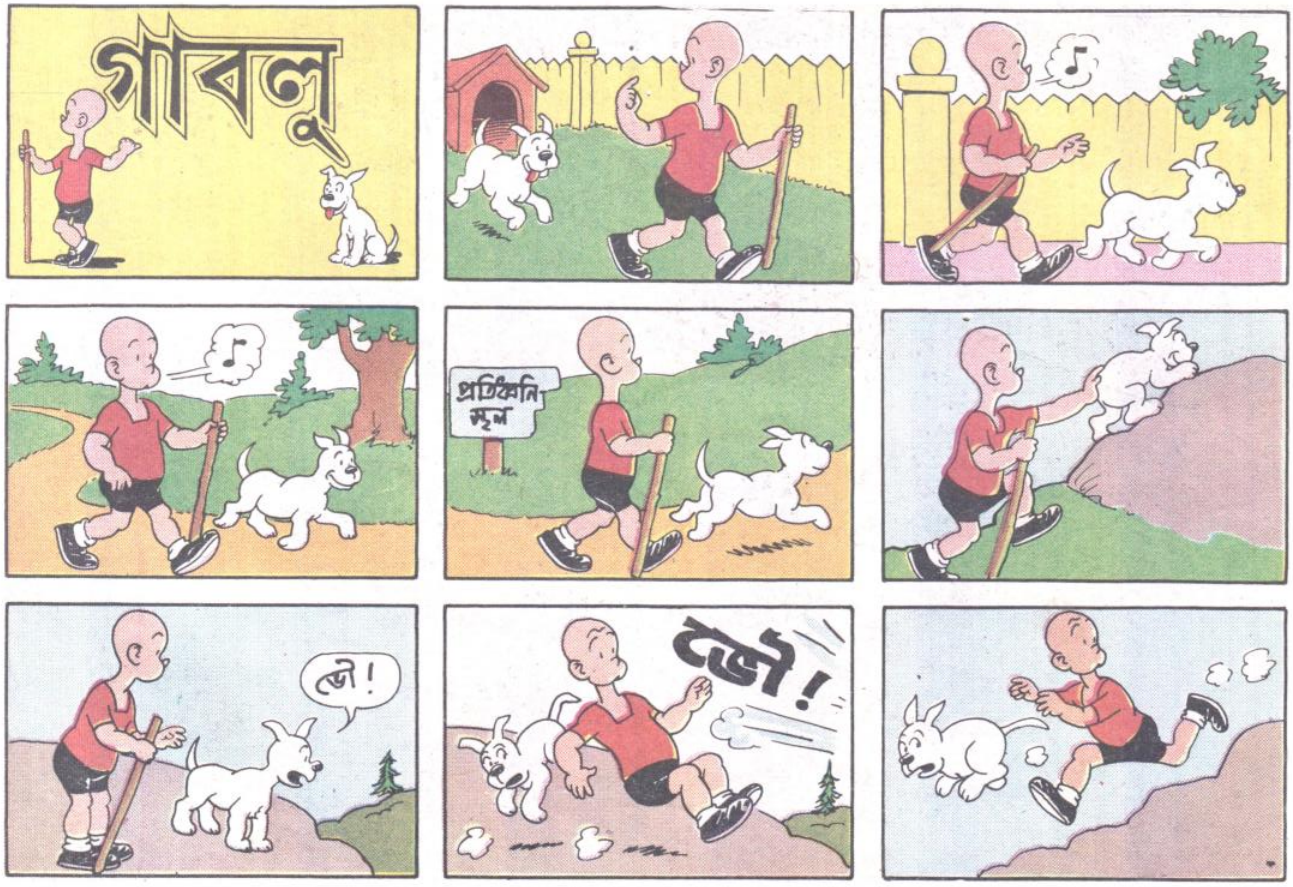

গাবলু
প্রতিধ্বনি স্থল
ভৌ!
ভৌ!

নাগনাগিনীর গল্প

কুন্তক

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল টুম্পি : দূর ছাই, ভাল লাগে না কিছু।

নন্তু বলল : আমারও।

একটু পরে জিজ্ঞেস করল নন্তু : বলতে পারিস টুম্পি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা কোন্‌টা?

না। পৃথিবীর সব-কিছু পড়েছি নাকি আমি?

না পড়ে বলা যায় না? আমি তো পারি। শোন্‌ তবে—'ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না/ হিংসুটি তোর রকমসকম কালনাগিনী!' কী-রকম? এই কথাটাই এখন তোর বলতে ইচ্ছে করছে না? আমি তো রোজ বলি।

কার লাইন রে দাদা?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। পরেরটুকু আর মনে নেই অবশ্য।

কালনাগিনীটা কে?

যখন যে তখন সে। তোর ওপর বিরক্ত হলে তুইই কালনাগিনী, গোটা পৃথিবীর ওপর রাগ করলে গোটা পৃথিবীই।

জানলা দিয়ে বাইরের পাঁচিলটাকে দেখতে দেখতে টুম্পি বলল : নাগ দিয়ে কেবল একটা লাইনই জানি আমি। সত্যেন দত্তের। আমরা হেলায় নাগেরে নাচাই নাগেরই মাথায় নাচি।

হাঃ, ভারী তো লাইন!

কেন, খারাপ হল কিসে?

নাচিস তুই নাগের মাথায়? যা না দেখি, কত সাহস!

আর তুমি যেন ওই কালনাগিনীর সব খবর জানো!. আমাদের মিস্‌ বলেছেন,

ওখানে কৃষ্ণের কালীয়দমনের কথা আছে। নাচেননি কৃষ্ণ সাপের মাথায় উঠে?

কৃষ্ণ নেচেছিলেন তো নেচেছিলেন। তার সঙ্গে আমাদের কী?

ওদের কথার মধ্যে এবার ঢুকে পড়ি আমিও। বলি : বিষ্ণু দে-র নাম জানিস তো? বিষ্ণু দে একটা কবিতা লিখেছিলেন কিছুদিন আগে, তাতেও ছিল ওই কালীয়দমনের কথা। কবিতাটা ছিল ভিয়েতনাম নিয়ে।

ভিয়েতনাম? ভিয়েতনামেও কৃষ্ণের গল্প আছে বুঝি?

না। কিন্তু ভিয়েতনামের যুদ্ধটাই কারো কাছে কৃষ্ণের গল্প হয়ে উঠতে পারে তো? ছোট্ট কৃষ্ণ যেমন বিপুল কালীয়কে হারিয়েছিল—

ও, সেইরকম ছোট্ট দেশ ভিয়েতনাম হারিয়ে দিল প্রকান্ড আমেরিকাকে?

দেয়নি তখনো। কিন্তু দেবেই বলে আশা করছিলেন কবি। ঠিক তেমনি, আমরা সকলেই তো নাগনাগিনীর ওই বাধা টপকে যেতে পারি। পারি না?

আঃ হা, আমার মনে পড়েছে আরেকটা লাইন, রবীন্দ্রনাথের। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস/শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' এও তো সেই গোটা পৃথিবীর গন্ডগোলের কথা, না? সত্যি, সবাই যে কেন এত মারামারি করে!

তা না-হয় করল। কিন্তু সেজন্য কেবল সাপকে নিয়েই টানাটানি কেন?

অন্যদের নিয়েও হয়। তবে এটা ঠিকই যে ক্রুর হিংস্র বিষাক্ত আক্রমণের কথা ভাবলে প্রথমে সাপের ছোবলটাই মনে পড়ে। একটা আরেকটার প্রতীক হয়ে গেছে।

কী হয়ে গেছে?—জিজ্ঞেস করে টুম্পি।

ওই যাঃ, বলে ফেললাম বুঝি শব্দটা? তাহলে তো বলতেই হয়। প্রতীক হয়ে গেছে। এ-রকম অনেক প্রতীক ছড়িয়ে আছে আমাদের ব্যবহারে, আমাদের কথায়বার্তায়। সেইটেই শুনতে পাস কবিতায়, গানে।

খারাপ কথা বলতে নেই, তাই প্রতীক? সাপকে যেমন লতা বলে?

আরে না না। তা কেন? ভাল কথারও প্রতীক হতে পারে। কী বলিস নন্তু, তেমন লাইন কিছু মনে পড়ে তোর? ভেবে দ্যাখ দেখি।

(ক্রমশ)

অতিথি

প্রসাদ

সেদিন সন্ধে হতেই কলকাতার ওপর দারুণ দুর্যোগ নেমে এল।

যেমন বৃষ্টি, তার সঙ্গে তেমনি ঝড়, আর তেমনি মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলক, বজ্র পাত। চামেলি একবার যেই সদর দরজা খুলে দেখতে গেছে রাস্তায় কেমন জল জমেছে, অমনি জলের ঝাপটায় তার জামা ভিজে একেবারে জবজবে। তখন সেই দরজা বন্ধ করে, চামেলির সাধ্য কী? বাবা এসে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে দরজা বন্ধ করলেন। ততক্ষণে ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

কোথায় যেন মড়মড় করে একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। কিংবা কে জানে, হয়তো গাছই একটা কাত হল।

তার একটু পরেই কলিং বেলটা বেজে উঠল টিংটিং করে।

"Who can it be?" Mr. Roy said, annoyed.

He went and opened the front door.

A man was standing outside.

"I'm terribly sorry," he said, "but may I..."

Mr. Roy cut him short. "Please come in first and talk later. We can't stand here talking."

The man stepped in, water running off his clothes in streams.

He started apologising again and was again cut short, this time by Mrs. Roy.

"Not another word," she said. "We must get you some dry clothes first."

"Please don't trouble yourself," the stranger hastened to stop her. "I'm very grateful to you as it is, for letting me come in. I don't live far from here. I'll leave as soon as the rain lets up a bit."

"No trouble at all," Mrs. Roy said and went to get a change of clothes.

In about fifteen minutes the man was sitting in a chair in Mr. Roy's clothes, sipping hot tea.

He had introduced himself by then.

বাইরে বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে, ঝড়ের দাপটও শেষ। আগন্তুক যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

"A little more tea, Mr. Barua, before you go?" asked Mrs. Roy.

"Thank you, Mrs. Roy. May I call again in a day or two, with my wife? We've just come from Assam and my wife feels quite lonely at times."

"Do come. I hope you'll like Calcutta."

"I'm sure we shall. Would you mind teaching her a little Bengali?"

"Of course not. Could you come tomorrow?"

"Tomorrow? I'm afraid not. We can come on Saturday, perhaps, unless you're busy then. But I'll send the clothes back tomorrow, in any case."

"Saturday will be fine."

লক্ষ করো ঃ

Would you mind?
Could you come?
Of course not.
I'm afraid not.

বাঘা

কী করছিস হারু ?
পেরেক তুলছি !

কেন ?
না তুললে এর উপর অনেকের পা পড়বে !

পড়লে তারা জখম হবে !

তুই নিজেই জখম হয়ে গেলি যে !

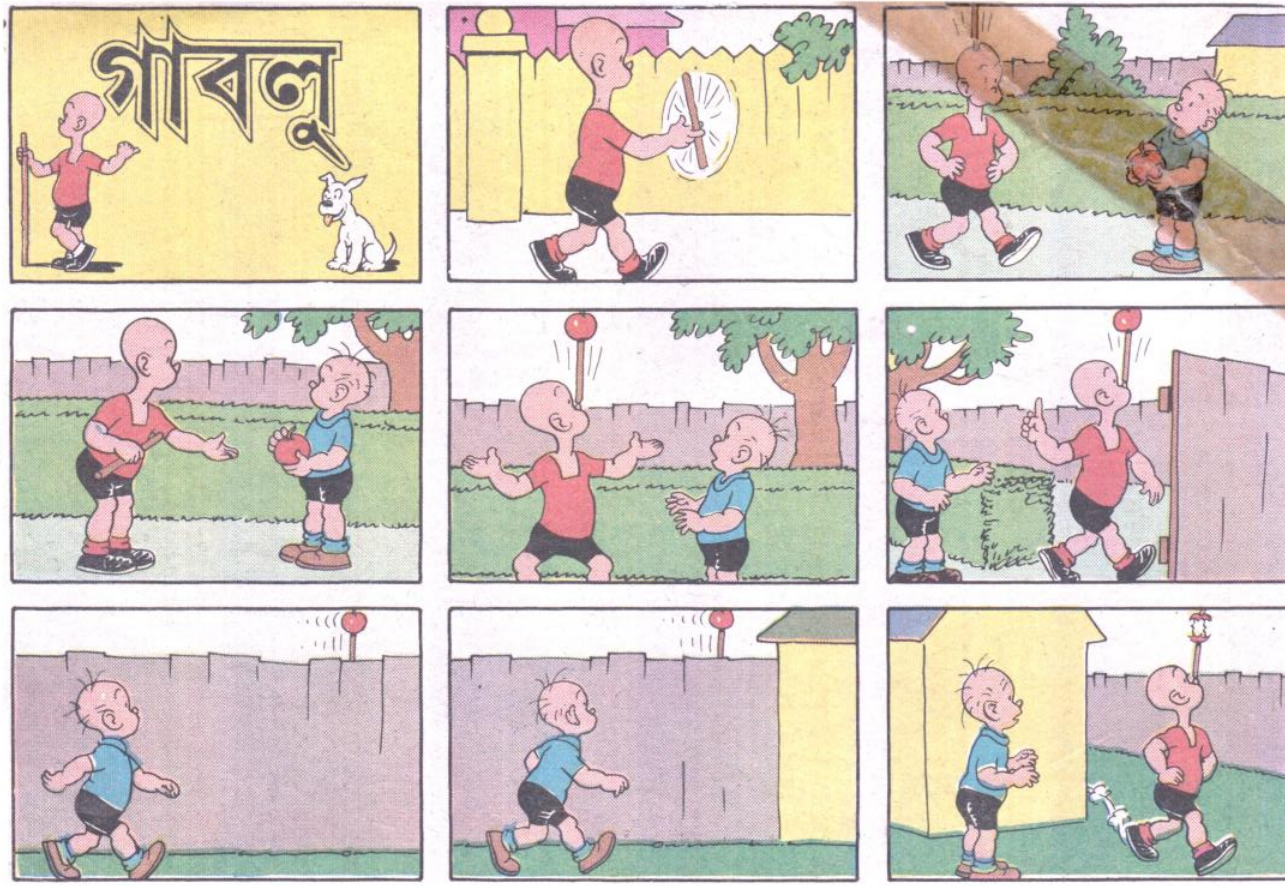
গাবলু

ভুল-ভোলানো মন্ত্র

অনিরুদ্ধ কর

ডাইনি বুড়ির ডান-চোখেতে
দৃষ্টি ছিল কম
ডানদিকে তাই ঝাপ্‌সা-মতো
দেখত যত কিছু ;
ডান হাতটাই এড়াত তার
চক্ষু একরকম,
ডান পা-টা তার ফিরত বাঁয়ের
কেবল পিছু পিছু।

মোড়ের মাথায় পৌঁছে বুড়ি
বাঁয়েই নিত মোড়,
বাঁ-চোখ বুজে ভাবত সে যে
ডানদিকটা বাজে,
ডানদিকটা তাক করে সে
আওড়াত মন্তর—
মিলিয়ে যেন ডানদিকটা
সবটা হত বাঁ যে!

এখন বুড়ির দুটোই বাঁ পা,
বাঁ হাত—তাও দুই,
দুই বাঁ চোখে দৃষ্টি তবু
হল না হায় উল্টা!
পুরনো ডান-চোখ যে এখন
নতুন বাঁ চক্ষুই
ভুল-ভোলানো মন্ত্রে সে তাই
ভোলাচ্ছে সেই ভুলটা।

সামলে পকেট

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কু ঝিক্ ঝিক্ কু ঝিক্ ঝিক্
আওয়াজ তুলে কে যায়?
আওয়াজ তুলে যাক যে যাওয়ার—
সঙ্গে কাকে নে যায়?
সঙ্গে নে যায় ভিনদেশী লোক
কেমন তাদের মেজাজ?
মেজাজ কারুর ভীষণ শরিফ
কেউ রেগে টং বেজায়!
কেনই বা কেউ খুশমেজাজে
কেউ রেগে টং কেন?
পুঁচকেরা কেউ দাপায় বা কেউ
লাগায় ঘ্যানর ঘ্যানর?
তিনমাথারা বুদ্ধি বিলোয়
প্যানপ্যানানি পুঁজি,—
লাভ কী তাদের আচরণের
কারণ খোঁজাখুজির!
কেউ খুক্ খুক্ কাসেন আবার
কেউ ফিক্ ফিক্ হাসেন,—
কেউ বা নিজের গোঁফটিতে তা
দিতেই ভালবাসেন!
হাসুন, কাসুন, তা দিন গোঁফে
যার যা মেজাজ, মর্জি,—
সামলে, পকেট কাটলে তখন
দেবেন না দোষ দর্জির!

ছবি দেবাশিস দেব

CAS/OPPL/3/80/BEN

আশ মিটিয়ে আকাশ-ছোঁয়া
মহল বানাবো···
সবদিকেতেই রঙবেরঙের
জেম্‌স লাগাবো !

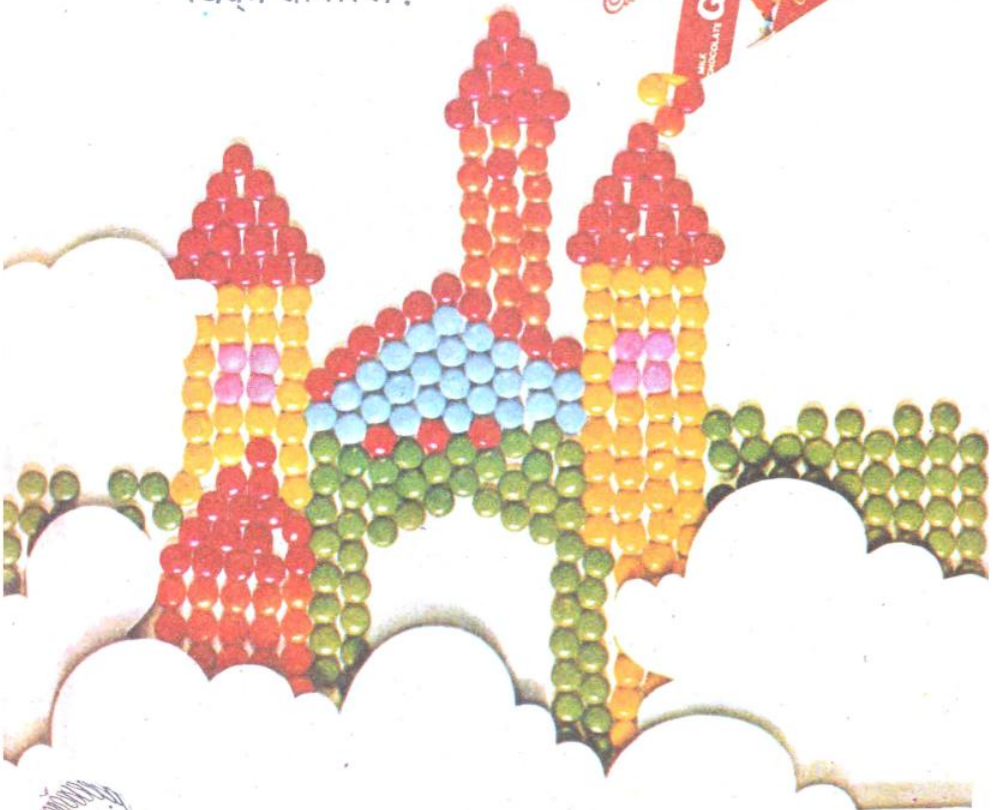

OBM.6065 BN

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!